[অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী—৩]

মনুষ্য
ইহলোকে ও পরলোকে।

শ্রীআশুতোষ দেব এম্, এ,

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক
লোটাস্ লাইব্রেরী,
৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা :
৬৪।১ ৬৪।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[মূল্য—৷৷০ আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

সময়ে সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এই পুস্তকের অধিকাংশ বন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি কিছু পরিবর্দ্ধিত বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ত্যুর পরপারে মানবের কি গতি হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ববৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহজীবনে কিরূপে জীবন নর্ব্বাহ করিলে মানবের মৃত্যুর পর শুভকর হয়, তাহাও বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ বিষয় এখন আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত এবং সময়াভাবে তাহা এক্ষণে ঘটিয়া উঠিল না। অথচ অনেকের বিশেষ অনুরোধে এই পুস্তক শীঘ্র ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। যদ্যপি এই পুস্তক পাঠে পাঠকবৃন্দের কিছুমাত্র উপকার বোধ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

কলিকাতা,
১২০।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
১লা বৈশাখ ১৩১৭।

প্রকাশক
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত

মনুষ্য—ইহলোকে ও পরলোকে

প্রথম প্রস্তাব

মনুষ্য—ইহলোকে

মনুষ্য যত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার দিব্য শক্তি সকল জন্মিতে থাকে। অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য দিব্য-দৃষ্টি (Clairvoyance) লাভ করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূর্য্যচন্দ্রাদির স্থূল জ্যোতিঃ দেখিতে পাই, কিন্তু উহাদের সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ দেখিতে হইলে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হওয়ার প্রয়োজন। এই সূক্ষ্ম ঐন্দ্রয়িক যন্ত্র আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহাকে "পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড" (Penial Gland) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-বাদীরা (Spiritualists) বলেন যে, ইহা স্ফুরিত হইলে মনুষ্য দিব্য বা হরনেত্র লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (Clairvoyant) তাঁহারা যখন কোন মনুষ্যকে নিরীক্ষণ করেন, তখন কি দেখিতে পান ? তাঁহারা দেখেন যে, মনুষ্য, ধূম্রবৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে আবৃত রহিয়াছে। এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে জ্যোতিঃ-পরিবেশ বা ছটা (Aura) বলা হয়। এই ছটাকে উপনিষদ্ "ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা "আ-নখাগ্রাৎ আ-কেশাগ্রাৎ" ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মনির ডাক্তার রিচেন্‌ব্যাক্ (Richenback) পাশ্চাত্যদেশে

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, অয়স্কান্তের (Magnet) দুই সীমা হইতে দীপ-শিখার ন্যায় আলোক বাহির হয় এবং মনুষ্যমাত্রেরই মাথার চারিদিকে ঐরূপ আলোক বর্ত্তুলাকারে ঘেরিয়া আছে। আমরা দেবদেবীর অথবা মহাপুরুষের মূর্ত্তির মস্তকের চতুর্দ্দিকে যে ছটা অঙ্কিত অথবা কাগজাদি দ্বারা নির্ম্মিত দেখিতে পাই, তাহা যে কেবল রূপক, তাহা নহে; ঐরূপ ছটা বাস্তবিক বর্ত্তমান আছে। উহা যে কেবল মনুষ্যের মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া আছে, তাহা নহে; উহা তাহার শরীরের চতুর্দ্দিকেও ঘেরিয়া আছে। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, এই জ্যোতিঃপরিবেশের আকার ডিম্বের ন্যায়। ইহা দেহের ভিতরে ও বাহিরে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিত। যোগীরা বলেন যে, এই জ্যোতিঃপরিবেশ নানাপ্রকার মনোহরবর্ণযুক্ত। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় বস্তু,—সচেতন হউক বা অচেতন হউক, কিংবা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর অথবা মৃত্তিকাই হউক, সকল পদার্থই,—ধূম্রবৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। মনুষ্যের জ্যোতিঃপরিবেশ যত জটিল, অন্য বস্তু বা প্রাণীর জ্যোতিঃপরিবেশ সেরূপ নহে। প্রাচ্যেরা বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে ক্রমাগত জৈবিক শক্তি আকর্ষণ করিতেছে। মনুষ্য তাঁহার প্লীহার সাহায্যে উক্ত জৈবিক শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনুষ্য যত বলিষ্ঠ ও সুস্থ হন, তত অধিক পরিমাণে তিনি এই শক্তি গ্রহণ করিতে এবং চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতে থাকেন। চৌম্বক অথবা 'মেস্‌মেরিক' শক্তির (Magnetic or Mesmeric pass) চালনার দ্বারা একজন সুস্থব্যক্তি অপর একজন অসুস্থব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে এই শক্তি প্রদান করিতে পারেন। মনুষ্য আপনার চতুর্দ্দিকে অজ্ঞাতসারে বল ও জীবনীশক্তি সর্ব্বদা বিকীর্ণ করিতেছেন। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই জীবনীশক্তি গ্রহণ

করিয়াও, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের উপযোগী করিতে পারেন না। তাঁহারা যদি কোন অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তির নিকট যান, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনীশক্তি, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবে। অনেকে হয় তো এইরূপ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আমাদের নিকটে আসিলে, আমরা ম্লান হইয়া যাই, আমাদের স্ফূর্ত্তির লোপ হয়, আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি, আমরা যেন কেমন হইয়া যাই। আমরা আদৌ তাঁহাদের সঙ্গলাভে স্পৃহা করি না। ইঁহারা আমাদের জীবনীশক্তি কিয়ৎপরিমাণে শোষণ করিয়া থাকেন। সিয়ানস্ গৃহে (Seance Room) ভৌতিকীভবনে অর্থাৎ ভূত নামান গৃহে যখন স্থূলরূপ গ্রহণের (Materialisation) ঘটনা হয় তখন অধিক পরিমাণে এই প্রকার ক্লান্তি অনুভূত হইয়া থাকে।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেন যে, মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বা জ্যোতিঃপরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিভিন্ন স্তরে অথবা আবরণে বিভক্ত। প্রথম আবরণের নাম—ওজঃ বা স্বাস্থ্যপ্রভা (Health Aura)। ইহা ঈষৎ উজ্জ্বল—ইহার বর্ণ এত ক্ষীণ যে, বর্ণ নাই বলিলেই চলে। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা শুক্লবর্ণযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যপ্রভাকে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, জানিতে পারা যায় যে, অসংখ্য সরল রেখাসমূহ শরীর হইতে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সুস্থ ব্যক্তির এই সকল রেখা ঋজুভাবে থাকে; কিন্তু অসুস্থ পীড়িত ব্যক্তির এই সকল রেখা অসরল এবং বক্র ভাবে থাকে। কারণ, তখন ওজঃ দুর্ব্বল থাকে এবং প্লীহা জীবনী শক্তিকে অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে না। অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, মন বিষণ্ণ থাকিলে, কিংবা শরীরে কোন গুরুতর আঘাত লাগিলে, অথবা শরীরের কোন প্রকার ক্ষতি হইলে, স্বাস্থ্যপ্রভার (Health Aura) ক্ষতি হইয়া থাকে।

যাহাকে বাস্তবিক জ্যোতিঃপরিবেশ বলা যায়, যাহা মনুষ্যকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা অতি জটিলভাবে গঠিত। প্রথমদৃষ্টিতে ইহাকে উজ্জ্বল মেঘের ন্যায় দেখায় এবং শরীরের চতুর্দ্দিকে ইহা দেড় হইতে দুই ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, উহা দেখিতে ডিম্বাকার। প্রায় অনেক ব্যক্তির জ্যোতিঃপরিবেশের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে না। ইহার সীমা, যেন ক্রমশঃ অদৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যদি মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জ্যোতিঃপরিবেশের কেবল যে বিভিন্ন অংশ আছে, তাহা নহে। এই সকল বিভিন্ন অংশ নানাপ্রকার পদার্থের দ্বারা রচিত। তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটী ভিন্ন জ্যোতিঃপরিবেশ বলিয়া বোধ হয় এবং যদি একটী জ্যোতিঃপরিবেশ ভিন্ন অপর সকল অংশকে বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই একটী অংশ সমুদয় জ্যোতিঃপরিবেশের স্থান অধিকার করিবে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই জ্যোতিঃপরিবেশ সাত ভাগে বিভক্ত। কিন্তু উন্নত সাধকেরা এই জ্যোতিঃপরিবেশের কেবল পাঁচটী ভাগ দেখিতে পান।

এই সাতটী ভাগের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন এবং ভৌতিক (Physical), তাহার নাম স্থূল-শরীরজাত স্বাস্থ্য-প্রভা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার অপর নাম ওজঃ। ইহার বর্ণ এবং আকৃতি ভৌতিক শরীরের অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। তাহার পরে যে জ্যোতিঃপরিবেশ আছে, তাহার নাম চৌম্বক-প্রভা (Magnetic Aura)। ওজঃ এবং চৌম্বক-প্রভা, একই পদার্থ। ইহাদের মধ্যে একটির অবস্থা অন্যটির উপর নির্ভর করিতেছে। এই দুইটী জোতিঃ-পরিবেশের পর যে জ্যোতিঃপরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম কামনা প্রভা (Desire Aura)। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষের নিকট ইহা দর্পণবৎ প্রতীয়মান হয়। কারণ, এই প্রভায় সাধারণ মনুষ্যের

প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক অনুভূতি এবং অধিকাংশ চিন্তা, প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চিন্তার ফলে এই প্রভা হইতে স্বজীব সৎ অথবা অসৎ মূর্ত্তিসকল (Thought Forms) গঠিত হইয়া থাকে। আমাদের বাসনা এবং অনুভবের (Feelings) দ্বারা ইহাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সদিচ্ছা, কৃতজ্ঞতা, এবং ভালবাসা—শুভাকাঙ্ক্ষী সুন্দর চিন্তামূর্ত্তি সকল সৃষ্টি করিয়া পার্থিব ভূমিতে প্রেরণ করিয়া থাকে; ইহারা পার্থিব লোকের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু মন্দ ইচ্ছা, হিংসা, ঘৃণা এবং দ্বেষ—অনিষ্টকারী কুৎসিত মূর্ত্তিসকল সৃষ্টি করে; ইহারা পৃথিবীর ক্রমবিকাশের (Evolution) বাধা দিয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে, তদভিসম্পদ্যতে।" (৪—৪—৫)

অর্থাৎ,—মনুষ্য কামনাময়। সে যেরূপ কামনা করে, তাহার চিন্তা ও সেইরূপ হয়। তাহার যেরূপ চিন্তা হয়, তাহার কার্য্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। সে যেরূপ কার্য্য করে—সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্‌ল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" ৩-১৪-১

অর্থাৎ—মনুষ্য চিন্তাময়। মনুষ্য এই পৃথিবীতে যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকে, তাহার ফলে পরলোকে গিয়া সেইরূপ হইয়া থাকে। মৈত্রেয়োপনিষদে (৪-৩৪-৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমরা যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, তাহার ফলে আমরা সেইরূপ হইয়া থাকি। সুতরাং শুভ চিন্তার দ্বারা আমরা সৎ হই এবং অশুভ চিন্তার দ্বারা আমরা অসৎ হইয়া থাকি। আমরা অতীতে যেরূপ চিন্তা ও কামনা করিয়াছি, তাহার

ফলে ইহজন্মে আমরা সেইরূপ স্বভাবাপন্ন হইয়াছি। এই প্রকারে আমরা আমাদের অদৃষ্ট গঠন করিয়াছি। আমাদের অদৃষ্টের জন্য কেবল আমরাই দায়ী—অন্য কেহ নহে।

কামনা-প্রভার পর মানস-প্রভা (Mind Aura) দৃষ্ট হইয়া থাকে। কামনা ও মানস-প্রভা উভয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং যোগী ও এই প্রভা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, মনুষ্যের কি প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি হইতেছে। যদিও কামনাপ্রভা অপেক্ষা মানস-প্রভা অধিক বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে বটে,—যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি—কিন্তু মোটামুটি হিসাবে মানস-প্রভাই, কামনা প্রভাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। যদি কোন একটি বিশেষ কামনা সবেগে এবং ক্রমাগত স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে, ইহা মনের উপরও কার্য্য করে এবং মনেতেও ঐরূপ স্পন্দন উৎপন্ন করে। ইহার ফল এই হইবে যে, মানস-প্রভা, কামনা-প্রভার ন্যায় চিরকালের জন্য একই প্রকার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যাইবে। যদি কোন ব্যক্তি ভক্তি বা অনুরাগের দ্বারা ক্রমবিকাশের (Evolution) পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, কিংবা উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য ক্রমাগত চিন্তা করিতে থাকেন, অথবা মানবজাতির সেবা ও সাহায্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মানস-প্রভা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় অতি সুন্দর নীলবর্ণ ধারণ করিবে। যদি তাহার অনুরাগ, স্বার্থজড়িত হয়,—যেমন কোন বিশেষ আত্মীয় বা বন্ধুর জন্য যদি ভালবাসা জন্মে—তাহা হইলে তাঁহার মানস-প্রভা, গোলাপফুলের ন্যায় গোলাপীবর্ণ ধারণ করিবে। এইরূপে মানস-প্রভায় ব্যক্তিগত সৎ অথবা অসৎ গুণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পঞ্চম জ্যোতিঃপরিবেশ জীবাত্মার সহিত জড়িত রহিয়াছে।

ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট। ইহাকে সুন্দরবর্ণ-যুক্ত মেঘ বলিয়া বর্ণনা করা অপেক্ষা, সমুজ্জল আলোক বলিলে ঠিক হয়। ইহাকে বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত। ইহা জন্মান্তরগমনশীল জীবাত্মার আধার ও বাহক। ইহা জীবাত্মাকে জন্মান্তরে অনুসরণ করিয়া থাকে। কাহার কত দূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, এই জ্যোতিঃ-পরিবেশই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা দেখিতে অতীব সুন্দর।

ইহা ব্যতীত আর যে দুইটি পরিবেশ আছে, তাহারা বর্ণনাতীত। যাঁহারা বিশেষরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল প্রভা দেখিতে পান। আমাদের ভিতর কেহ কেহ হয় তো এই দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন; কিন্তু এইরূপ আশা করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, ভবিষ্যৎকালে এই দিব্যদৃষ্টি অনেকেই লাভ করিবেন। যাঁহারা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করেন এবং সত্য, বিশুদ্ধি ও ভক্তির পথে বিচরণ করেন, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতে থাকে এবং অবশেষে তাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন।

যেরূপ বর্ণের জ্যোতিঃপরিবেশ যেরূপ বাসনা, কামনা বা ইচ্ছা সূচিত করে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল—

১। জ্যোতিঃপরিবেশ কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় মেঘের আকার ধারণ করিলে তাহা দ্বারা হিংসা ও দ্বেষ জ্ঞাপিত হয়।

২। জ্যোতিঃপরিবেশে যদি কৃষ্ণবর্ণ ভূমির উপর গভীর রক্ত-বর্ণের বৈদ্যুতিক ছটা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা ক্রোধের ব্যঞ্জক হইয়া থাকে।

৩। অগ্নিশিখার ন্যায় লালবর্ণের জ্যোতিঃ-পরিবেশের দ্বারা, পাশবিক রিপুসকল সূচিত হইয়া থাকে।

৪। মরিচা ধরা লৌহের যে বর্ণ, জ্যোতিঃপরিবেশ সেই বর্ণের হইলে অতিশয় লোভ জ্ঞাপিত হয়।

৫। জ্যোতিঃপরিবেশ যদি পাণ্ডু কপিশবর্ণ (Dull Brown Grey) বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তির জ্যোতিঃপরিবেশের বর্ণ এইরূপ।

৬। ঈষৎ শ্বেতবর্ণযুক্ত মেটে রঙ্, গভীর বিষণ্ণতার পরিচায়ক।

৭। মলিন পাংশুবর্ণের (Livid Grey) দ্বারা ভয় প্রকাশিত হয়। ইহা অতি জঘন্যবর্ণ।

৮। শ্বেতাভাবিশিষ্ট সবুজ বর্ণের (Grey Green) দ্বারা প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৯। কপিশ বর্ণের আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের (Brownish Green) মধ্যে যদি পাংশুল লাল (Dull Red) বর্ণের ছটা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে হিংসা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

১০। জ্যোতিঃপরিবেশের বর্ণ যদি গোলাপ ফুলের বর্ণের ন্যায় হয়, তাহা হইলে ভালবাসা সূচিত হইয়া থাকে। ভালবাসার তারতম্যানুসারে ইহার বর্ণ, নানাবিধ হয়। ভালবাসা যত স্বার্থশূন্য ও পবিত্র হইতে থাকে, জ্যোতিঃপরিবেশও তত গাঢ় রক্তবর্ণ (Dull Crimson) ছাড়িয়া গোলাপ ফুলের আভা ধারণ করিতে থাকে। যখন এই গোলাপী রঙ্ অতি উজ্জ্বল এবং লাক্ষা (Lilac) বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত হয়, তখন তাহা মানবজাতির প্রতি ভালবাসা জ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

১১। জ্যোতিঃপরিবেশ যদি কমলালেবুর বর্ণের ন্যায় সুন্দর হরিদ্রাবর্ণযুক্ত হয়, তাহা হইলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা (Ambition) বুঝা যায়। ইহা যদি কপিশ (Brown) বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহা হইলে গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং গর্ব্বের বিচিত্র-

তার দ্বারা ইহার এত প্রকার বর্ণবৈচিত্র্য হয় যে, তাহার বর্ণনা করা যায় না।

১২। হরিদ্রাবর্ণ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক। মেটে (Dull) হরিদ্রাবর্ণ, নিম্নতর বুদ্ধিবৃত্তির, এবং সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হরিদ্রা-বর্ণ উচ্চতর বুদ্ধির জ্ঞাপক।

১৩। উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের এবং জীবনীশক্তির পরিব্যঞ্জক।

১৪। গভীর এবং পরিচ্ছন্ন নীলবর্ণ, ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। নীল বর্ণ হইতে বেগুনে বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১৫। ঈষৎ নীলবর্ণের জ্যোতিঃপরিবেশ, গভীর ভক্তির পরিচায়ক; ইহাতে মনুষ্যের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

১৬। উজ্জ্বল লাক্ষাবর্ণযুক্ত (Lilac) নীলবর্ণ, গভীর আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। যখন ইহা উজ্জ্বল নক্ষত্রকণার দ্বারা শোভিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের উচ্চাশা প্রকাশ করিয়া থাকে।

জ্যোতিঃপরিবেশ পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার বর্ণে শোভিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া, অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উন্নত সাধকগণ জ্যোতিঃপরিবেশ-সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুই একটি বিষয় মাত্র উপরে উল্লিখিত হইল।

জ্যোতিঃপরিবেশ বুঝিতে হইলে—মনুষ্য, কি কি উপাদানে গঠিত, তাহা স্মরণ করা উচিত। শাস্ত্রে মনুষ্যকে তিনটি শরীরে বিভক্ত করা হইয়াছে; জীবাত্মা এই তিন শরীরের সাহায্যে বিভিন্ন লোকে কার্য্য করিয়া থাকেন। যথা ঃ—

(১) স্থূল শরীরের সাহায্যে......ভূলোকে (Physical Plane)

(২) সূক্ষ্ম শরীরের সাহার্য্যে —
- ভূলোকে (Physical Plane)
- ভুবর্লোকে (Astral Plane)
- স্বর্লোকে (Lower Mental Plane)
- মহর্লোকে (Higher Mental Plane)

(৩) কারণ শরীরের সাহায্যে
- জনলোকে (Buddhic Plane)
- তপলোকে(Buddhic Plane)
- সত্য লোকে (Nirvanic Plane)

এই সকল শরীর আবার বিভিন্ন কোষের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। আহারাদির দ্বারা যে কোষ পুষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে অন্নময় কোষ বলে। স্থূল শরীর বা ভাণ্ডদেহকে (Dense Body) অন্নময় কোষ বলা হয়। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত হইয়াছে। ভূলোকের ঈথিরীয় পদার্থের দ্বারা প্রাণময় কোষ গঠিত হইয়াছে। ভূলোক সপ্তপ্রকার পার্থিব উপাদানে গঠিত; যথা,—কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও ঈথিরীয়। ঈথার (Ether) আবার চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—Radiant matter, Etheric, Super-Etheric এবং Atomic। পাশ্চাত্ত্যেরা ঈথারকে উক্ত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কঠিন তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ দ্বারা ভাস্তদেহ রচিত হইয়াছে এবং উক্ত চারি প্রকার ঈথারের দ্বারা প্রাণময় কোষ গঠিত হইয়াছে। প্রাণময় কোষের অপর নাম পিণ্ডদেহ বা ছায়া শরীর (Etheric Double)। মনোময় কোষ সূক্ষ্মশরীরকে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মনকে শাস্ত্রে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা,—(১) নিম্নমন (Lower Manas) ও (২) উচ্চ মন (Higher Manas)। কামনা-সংযুক্ত বহির্ম্মুখী মনকেই নিম্নমন বলে এবং কামনা-বিচ্ছিন্ন অন্তর্ম্মুখী মনকেই উচ্চমন বলে। ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের উপকরণের দ্বারা মনোময় কোষ রচিত

হইয়াছে। মনোময় কোষ কামনা-সংযুক্ত নিম্ন-মনেরই উপাধি মাত্র। মহর্লোকের উপাদানের দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ গঠিত হইয়াছে। ইহা কামনাহীন উচ্চ মনের উপাধি মাত্র। বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীর মহর্লোকের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। জন, তপ ও সত্য লোকের উপকরণের দ্বারা কারণ-শরীর রচিত হইয়াছে। আনন্দময় কোষ ও কারণ-শরীর একই পদার্থ। এই সপ্তলোকের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। পঞ্চকোষ হইতে মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে গিয়া থাকে এবং তখন জীবাত্মা পর-পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

মৃত্যুর সময় প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। তখন অন্নময় কোষ বা স্থূল শরীর মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। জীব তখন কারণ এবং সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করেন। তৎপরে প্রাণময় শরীর সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিচ্যুত হয় এবং জীব তখন প্রেতলোকে প্রস্থান করে। ভুবর্লোকের অংশ-বিশেষকেই প্রেতলোক বলে। মনুষ্য যদি এই পৃথিবীতে অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে মনোময় কোষের স্থূল উপকরণের দ্বারা তাহার ধ্রুব শরীর বা যাতনা শরীর গঠিত হয় এবং সে ঐ শরীরে তাহার কুকর্ম্মের ফলভোগ করে। যদি সেই ব্যক্তি সৎ লোক হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্থূল উপকরণ ক্রমশঃ দেহচ্যুত হয় এবং সেই ব্যক্তি তখন কতক পরিমাণ শুদ্ধ মনোময় কোষ লইয়া পিতৃলোকে উপনীত হয়। এই পিতৃলোক উপনিষদে জলীয় লোক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; ইহা ভুবর্লোকের অপর একটি অংশ মাত্র। মনোময় কোষ যখন কামনা হইতে একেবারে পরিশুদ্ধ হয়, তখন সাধারণ ব্যক্তি স্বর্গলোকের অংশ-বিশেষে প্রস্থান করিয়া থাকে। এই অংশ-বিশেষকে চন্দ্রলোক বলে। কৌষিতকী উপনিষদে চন্দ্রকে স্বর্গের দ্বার বলা হইয়াছে।

স্বর্গলোকের অন্যান্য অংশও আছে; যেমন, ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতি। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ফলে জীব এই সকল লোকে আসিয়া থাকে।

এই তিন লোকে জীবের জন্মমৃত্যুচক্র আবর্ত্তিত হইতেছে। সাধারণ ব্যক্তি এই তিন লোকে যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু অসাধারণ যোগী ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঊর্দ্ধতন লোকসমূহে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

সাধারণ মনুষ্য, প্রথম তিনটী ভূমির ঊর্দ্ধে তাহার সংবিৎকে লইয়া যাইতে পারে না। এই তিন লোককে পুরাণে ত্রিলোকী আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য গীতাতে 'দেহী' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন কোষ বা শরীরের সাহায্যে 'দেহী' সত্বাদি গুণত্রয় ভোগ করিতে থাকেন, এবং ক্রমশঃ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি দেহের সংযোগ ব্যতীত আপনার অস্তিত্ব বোধ করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি মুক্ত হন। জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য এক একটী কোষ অথবা শরীর, সংবিতের এক একটী আধার বিশেষ। মনুষ্য যখন ভূর্লোকে অর্থাৎ ভৌতিক জগতে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকেন, তখন স্থূল শরীর অর্থাৎ ভাণ্ড ও পিণ্ড-দেহ-সাহায্যে কার্য্য করেন। যখন তিনি ভুবর্লোকে অর্থাৎ প্রেত জগতে (Astral World) জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তখন কামশরীরের (Desire Body) সাহায্যে কার্য্য করেন। যখন তিনি স্বর্গলোকে (বৌদ্ধেরা যাহাকে রূপলোক বলে, তথায়) জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তখন তিনি মানস (Mental) শরীরের সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকেন। যখন তিনি অরূপলোকে জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তখন তিনি উচ্চ মানস শরীর অর্থাৎ বিজ্ঞানময়-কোষে কার্য্য করেন। যখন তিনি

তুরীয় লোকে জ্ঞান সঞ্চয় করেন, তখন তিনি বুদ্ধিশরীর বা আনন্দময় কোষের (Sipiitual Body) সাহায্যে কার্য্য করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য মনুষ্য, বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন কোন মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন এই সকল কোষের বা শরীরের সমষ্টিকে জ্যোতিঃপরিবেশরূপেই দেখিতে পান। অন্যান্য শরীরের ভিতর স্থূল শরীরকে দানার (Crystal) মত দেখায়। অন্যান্য শরীরসকল ইহাকে ঘিরিয়া থাকে এবং ইহা সকল শরীর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম। স্থূল শরীরের পর ঈথিরীয় শরীর বা প্রাণময়কোষ এবং তাহার পর কামশরীর বা মনোময় কোষের নিম্ন অংশ দৃষ্ট হয়। এই শরীর, সাধারণ লোকের কামস্বভাবের পরিচায়ক। ইহা নীচ আকাঙ্ক্ষা, নীচ প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা গঠিত এবং মনুষ্য যে পরিমাণে পবিত্রতা লাভ করে, সেই পরিমাণে এই শরীরের সূক্ষ্মতার এবং বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে। নীচস্বভাবাপন্ন লোকের কামনাশরীর অত্যন্ত ঘনীভূত; কিন্তু উন্নত ব্যক্তির কামনাশরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ক্রমাভিব্যক্তির উচ্চতর সোপানে যিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার শরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। কামশরীরের পর মনুষ্যের উন্নত মানস শরীর লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তির এই শরীর অতি অল্পই পুষ্ট হইয়াছে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা মানসিক এবং নৈতিক উন্নতিশীল, তাঁহাদের এই শরীর নানাবিধ সুন্দরবর্ণযুক্ত বলিয়া অতি সুন্দর দেখায়। এই শরীরের পর কারণশরীর দৃষ্ট হয়। সাধারণ ব্যক্তির এই শরীর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যদি অধিক চেষ্টা ও যত্নের সহিত লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহা অতি অল্পই পুষ্ট হইয়াছে। উহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং

উহার কার্য্যকারিতা শক্তিও অতি সামান্য। কিন্তু যদি কোন উন্নত ব্যক্তির উক্ত শরীর লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব এবং তখন আমরা বুঝিব যে, এই শরীরই মনুষ্যের যথার্থ দেহ বটে। ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং বিভিন্ন বর্ণযুক্ত। ইহাতে এরূপ বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ আছে যে, তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বিশ্লেষিত সূর্য্যালোকের (Spectrum) ভিতর এই সকল বর্ণ লক্ষিত হয় না। যদি ভাগ্যক্রমে কোন মহাপুরুষের দর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাঁহার উক্ত শরীরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা অসাধ্য এবং তাহার মাধুর্য্য কল্পনার অতীত। সাধারণ ব্যক্তির জ্যোতিঃপরিবেশ দেড় ফুট হইতে দুই ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত; আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নত ব্যক্তির জ্যোতিঃপরিবেশ ৩০ হাত হইতে অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মহাপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদিগের জ্যোতিঃপরিবেশ, দেশদেশান্তর ও সাগর মহাসাগরের পর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে।

মানবীয় জ্যোতিঃপরিবেশ কাহাকে বলে, আমরা এই বার তাহা বুঝিতে পারিলাম। ইহা মনুষ্যের নিজেরই বিভিন্ন উপাধি সমষ্টি মাত্র; ইহাদের দ্বারা মনুষ্য সংবিতের বিভিন্নভূমি বা অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন। উন্নতির তারতম্যানুসারে মনুষ্য একাধিক ভূমিতে কার্য্য করিতে পারেন। এই জ্যোতিঃপরিবেশ, মনুষ্যের সংবিতের ভিন্ন ভিন্ন আধারের সমষ্টিমাত্র। মহাপুরুষদিগের অধ্যাত্ম শরীর, সকল প্রকার শরীর অপেক্ষা উজ্জ্বল ও সুন্দর; বুদ্ধিভূমিতে (Spiritual Plane) মনুষ্যের এই প্রকার বিকাশ হইয়া থাকে। তাহার পর তাহার কারণশরীর দৃষ্ট হয়। মানস জগতের অরূপভূমিতে অর্থাৎ মানস জগতের উচ্চতম প্রদেশে, এই শরীরের দ্বারা মনুষ্যের বিকাশ হইয়া থাকে। এই শরীর মনুষ্যের জ্ঞানের

ভাণ্ডার-বিশেষ। তাহার পর নিম্নমনঃ কর্ত্তৃক গঠিত মানস (Mental) শরীর, এবং তাহার পর যথাক্রমে কামিক* বা প্রেতশরীর (Astral) ঈথিরীয় বা পিণ্ড (Etheric) শরীর এবং পরিশেষে স্থূল (Dense) শরীর অবস্থিত রহিয়াছে। শেষোক্ত চারিটী শরীর প্রত্যেক জন্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহারা নশ্বর বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কারণশরীর এবং অধ্যাত্ম শরীরের পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া, উহাদিগকে অবিনশ্বর বলা যায়।

জ্যোতিঃপরিবেশসম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজনীয়। চিন্তার দ্বারা ইহা বিশেষরূপে স্পন্দিত হইয়া থাকে। বহিঃস্থ চিন্তার হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে, আমরা যদি এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করি যে, আমাদিগের জ্যোতিঃপরিবেশের বহির্ভাগ ঘনীভূত হইয়া কোষের (Shell) আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে চিন্তার প্রভাববশতঃ জ্যোতিঃপরিবেশের বহিঃস্থ চতুর্দ্দিকের সূক্ষ্ম পদার্থ সকল কোষের আকার ধারণ করিবে। তাহা হইলে কামনাভূমিতে যে সকল চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগের জ্যোতিঃপরিবেশ আর স্পন্দিত হইবে না, সুতরাং ইহার কোন ক্ষতি হইবে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য, চিত্রগুপ্তের খাতায় অঙ্কিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর মনুষ্য, যখন যমলোকে নীত হয়, তখন চিত্রগুপ্ত-লিখিত সদসৎ কর্ম্মের তালিকা-অনুসারে মনুষ্যের সুখ কিংবা শাস্তি ভোগ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলনকারীরা অবগত আছেন যে, মনুষ্যের জ্যোতিঃ-পরিবেশই "চিত্রগুপ্ত" নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম গুপ্তচিত্র। মনুষ্য যখনই যে কোন কর্ম্ম করে, অথবা যে কোন চিন্তা করে, তাহার ছাপ (impression) তাহার জ্যোতিঃপরিবেশের উপর পড়িয়া

যায়। তাহার চিন্তা সকল জ্যোতিঃপরিবেশের সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করে এবং তাহার কার্য্যসকল সংস্কাররূপে পরিণত হয়। আমরা যে সময় ভূমিষ্ঠ হইয়াছি এবং যে সময় এই নশ্বর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া যমলোক বা ভুবর্লোকে চলিয়া যাইব, সেই সমুদয় কালের কার্য্য ও চিন্তাসকলের অবিকল চিত্রসকল যমলোকে দেখিতে পাইব। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা এই চিত্রশালায় চিত্রসকল দেখিতে পান। মৃত্যু-মুখে পতিত জলমগ্ন ব্যক্তি, অথবা আকস্মিক দৈব ঘটনার দ্বারা আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে এই চিত্রশালায় তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলি যথাযথ চিত্রিত দেখিতে পান। সুতরাং চিত্রগুপ্তের কথা অলীক নহে। শুভাশুভ চিত্রাঙ্কণ করা আমাদের হাত। আমরা যদি শুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে উত্তম চিত্রসকল অঙ্কিত হইবে। তাহার ফলে আমরা সুখভোগ করিব। যদি আমরা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে মন্দ চিত্রসকল অঙ্কিত হইবে এবং তাহার ফলে আমরা দুঃখ ভোগ করিব।

আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ মনুষ্যসমূহকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে কেহ না কেহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ক্রমাভিব্যক্তির যে অবস্থায় তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন, সেই অবস্থার উপযোগী শরীরের দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকাশিত করিতেছেন এবং সংবিতের আধারসমূহের উন্নতির তারতম্য অনুসারে এই বিপুল বিশ্বের এক ভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য ভূমিতে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্থান করিতেছেন। আমাদের জ্যোতিঃপরিবেশ, আমাদের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যতই আমরা যথার্থ মনুষ্য হইতে চেষ্টা করি, ততই আমরা ইহার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকি; যতই আমরা উত্তমভাবে এবং উচ্চধরণের জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহ করি, আমরা ততই ইহাকে শোধিত করিতে থাকি এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর গুণসকল ইহার সহিত গ্রথিত করিয়া লই।

আমরা যখন স্থুল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করি, তখন কেবল হীনতা, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি দেখিতে পাই এবং এই মনুষ্যজাতি যে, কোন কালে এই সকল ত্যাগ করিয়া উন্নত হইবে, তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন অলৌকিক বা দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হই, তখন আমরা কি জানিতে পারি? তখনও এই হীনতা, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহা ব্যতীত ইহাও দেখিতে পাই যে, উহারা জলবুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী; উহারা মনুষ্যজাতির শৈশব অবস্থার ব্যাধিমাত্র, এবং কালক্রমে সকল মনুষ্যই, এই ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবে। আমরা যখন অতি নীচ, অতি ঘৃণিত, অতি হীন এবং অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিবিশেষকে দেখি,—তখনও জানিতে পারি যে, উহাদেরও উন্নত হইবার আশা এখনও বিনষ্ট হয় নাই এবং ভবিষ্যতে তাহার কিরূপ উন্নতি হইবে তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। পরাবিদ্যা (Theosophy) জগতে আশার দূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—গভীর নিনাদে জগৎ প্রতিধ্বনিত করিয়া জানাইতেছেন যে, অজ্ঞানতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় আছে,—দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার আশা আছে। ইহা কল্পনা নহে—যথার্থ কথা; কেবল আশামরীচিকা নহে, ধ্রুব সত্য।

পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, যিনি এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিয়া বিভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং পুনঃপুনঃ তাহা ত্যাগ করেন,—যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাঁহার উন্নতি হইতেছে এবং যিনি অল্পে অল্পে ভূয়োদর্শন সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ

করিতেছেন, আমরা তাঁহাকেই 'মনুষ্য' বলিয়া থাকি। এই মনুষ্যই, ভৌতিক, কামিক এবং মানসিক ভূমিতে কার্য্য করিয়া থাকেন। মনুষ্য স্থূল মস্তিষ্কের সাহায্যে স্থূল জগতের যে সকল স্পন্দন গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই সকল স্পন্দন কামিক শরীরে ইন্দ্রিয়-পরিণাম (Sensation) রূপে পরিবর্ত্তিত হয়; এই ইন্দ্রিয়-পরিণাম অবশেষে মানস-শরীরে গিয়া অনুভূতি-রূপে (Perception) পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের এই সকল শরীর, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অবস্থায় সংবিদ্-বহনের বিভিন্ন উপাধিমাত্র। সাধারণ মনুষ্যের এই তিন অবস্থার সংবিতের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কোন ক্রমে যদি তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে আমাদের সংবিতের বাহকসকল, আমাদিগের নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয় হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে এই সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়? সকলেই অবগত আছেন যে, আমরা চিন্তার দাস; আমাদের কোন চিন্তার সহিত কোন চিন্তার সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু যাহাতে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা করা উচিত। এইরূপ করিতে হইলে, তাহার উপায় স্বরূপ দুইটী সোপান আছে। প্রথম মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমরা চিন্তা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করিব। এইরূপ করিলে, মানস-শরীর এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, উহা চিন্তাকে স্থগিত না রাখিয়া একটী চিন্তাকে অন্য চিন্তার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্ক ও সেই ভাবে গঠিত হইবে। উহা তখন উহার প্রভুর নিকট যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। উহার প্রভু, যাহা মনে করিবে, উহা তখন তাহাই করিবে।

স্থূল দেহের যন্ত্রসকল সুগঠিত হইলে, কামিক দেহও সেই ভাবে গঠিত হইবে। যখন কোন মনুষ্য তাহার মস্তিষ্ককে নিজের বশে

রাখিতে শিক্ষা করে,—যখন সে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিতে শিখে এবং সেই ব্যক্তি যে বিষয়ে ইচ্ছা সেই বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তা করিতে পারে, তখন তাহার উন্নতির একটী সোপান মাত্র গঠিত হয়। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি, দ্বিতীয় শরীরের দ্বারা সংবিতের চালনা করিতে পারে, অর্থাৎ যখন সেই ব্যক্তি নিদ্রিত কিম্বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার কামিক শরীরকে, তাহার মানস শরীরের এবং স্থূল মস্তিষ্কের সংযোজক সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া সংজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার উন্নতির আর এক সোপান গঠিত হয়। সাধারণ মনুষ্য এবং এইরূপ উন্নত মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উভয়ই জাগ্রদবস্থায় কামিক শরীরে কার্য্য করে কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় এক জন সংজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্য করে এবং অপর ব্যক্তি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কার্য্য করে। প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি বাধিত হয়,—সে সাধারণ ভাবে দেখিয়া থাকে। তাহার কামিক শরীর পৃথগ্‌ভাবে সংবিৎকে বহন করিতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি, ভৌতিক পদার্থের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না; তিনি তখন ভুবর্লৌকিক দৃষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি তখন সমুদায় ভৌতিক পদার্থের ভিতর দিয়া দেখিতে পান, সম্মুখেও দেখিতে পান এবং পশ্চাতেও দেখিতে পান। গৃহভিত্তি এবং অন্যান্য অস্বচ্ছ পদার্থ-সকল, তাঁহার নিকট কাচের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়। তিনি তখন চিন্তার আকৃতি, বর্ণসকল এবং জ্যোতিঃপরিবেশ প্রভৃতি অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখিতে পান। তিনি যদি ঐক্যতান বাদন (Concert) শুনিতে যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, সুমিষ্ট শব্দ হইতে উৎপন্ন সুরসকল (Symphonies), অতি সুন্দর নয়নমনোহর এবং চমৎকার বর্ণ ধারণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি যদি কোন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন

যে. বক্তার চিন্তা সকল, বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করিয়া ভাসিতেছে। বক্তার ভাবসকল, ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হওয়ায়, যে পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, চিন্তার আকৃতির দ্বারা তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কারণ, যে সকল চিন্তা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহারা সুন্দরবর্ণ এবং সুস্বরযুক্ত ভুবর্লৌকিক আকৃতি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। উহারা কামিক পদার্থের দ্বারা গঠিত হওয়ায় অতি শীঘ্র আমাদের কামিক দেহে আঘাত করে।

নিদ্রার সময় মনুষ্যের যে সংজ্ঞা লোপ হয়, তাহার দুইটি কারণ আছে। হয় তাহার কামিক শরীরের পুষ্টি হয় নাই, অথবা সে ব্যক্তি আপন ভৌতিক মস্তিষ্কের সহিত স্বীয় কামনাশরীরের সংযোগ-সূত্র রচনা করিতে পারে নাই। মনুষ্য যখন জাগ্রত থাকেন, তখন তাঁহার মনের চিন্তারূপ তরঙ্গসকল, কামনা-শরীরের সাহায্যে মন হইতে ভৌতিক মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া থাকে। পরে সেই ব্যক্তি যতই উন্নত হইতে থাকেন, তত তাঁহার কামনা-শরীর স্থূল শরীরের সাহায্য ব্যতিরেকে কামলোকে কার্য্য করিতে থাকেন,—তিনি তখন হয়তো জানিতে পারেন না যে, জাগ্রত অবস্থায় তিনি ঐরূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার পর তাঁহার যত উন্নতি হইতে থাকে, তত তিনি তাঁহার স্থূল শরীরের সংবিতের সহিত মানসশরীরে সংবিতের সংযোজনা করিতে থাকেন। যখন আরও উন্নত হন, তখন পূর্ণ জ্ঞান সহকারে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে কার্য্য করিবার জন্য গমনাগমন করিয়া থাকেন।

তাহার পর সেই ব্যক্তি মানসভূমিতে সজ্ঞানে কার্য্য করিতে থাকেন। তখন তিনি স্থূল শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও এবং স্থূল জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিলেও, উচ্চতর ভূমির সমুদায় ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট থাকেন এবং সেই জগতে তখনও কার্য্য করিতে

থাকেন। তখন উচ্চতর বৃত্তিসমূহের উপভোগ করিবার জন্য, তাঁহাকে আর স্থুল শরীরকে ঘুম পাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। তখন তিনি অপর ব্যক্তির মানসিক কার্য্য জানিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে, তাঁহার উন্নতির আর এক সোপান গঠিত হয়। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই ধাপ যে উচ্চতর, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি ঐ ধাপে উঠিয়াছেন এবং উচ্চতম অবস্থায় উন্নত হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট ঐ ধাপ কিছুই নহে। তিনি তাঁহার মানস-শরীরে কার্য্য করিতে করিতে বুঝিতে পারেন, তিনি নিজে মনঃ নহেন; মনঃ হইতে তিনি ভিন্ন এবং মানস শরীর তাঁহার সংবিতের আধারমাত্র। তখন তাঁহার ভ্রমজ্ঞান দূর হয়, তখন তিনি জানিতে পারেন যে, পূর্ব্বে তিনি যাহাকে 'আমি' বলিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহার মানসশরীরযুক্ত 'আমি' মাত্র,—তাহা যথার্থ 'আমি' নহে; তাহা অপ্রকৃত 'আমি'। কিন্তু যাহা প্রকৃত 'আমি'—তাহা অরূপলোকস্থ কারণশরীরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি তখন মানসশরীর ত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তখন তাঁহার উন্নতির অন্য সোপান গঠিত হয়। এই সোপানে উঠিয়া, তিনি জানিতে পারেন যে, অসংখ্য জীবসমূহের পৃথক্ সত্তা নাই, উহারা বাস্তবিক এক, এবং তিনি স্বয়ং সকলের ভিতর অবস্থিতি করিতেছেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কিন্তু পূর্ব্বে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শরীরের ভিতর সংযোগসূত্র বর্ত্তমান ছিল কি না, ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ সংযোগ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ব্যবহার অভাবে উহা মরিচা ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল; ব্যবহার করাতে, উহা আয়ত্তাধীন হইয়াছে। বিভিন্ন শরীরের সংবিতের সংযোগসূত্রকে শাস্ত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে।

আমাদিগের শরীররূপ আধারসকলকে শোধিত করিলে এবং নিজের বশে আনিতে শিখিলে, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার সূত্রপাত করা হয়। কিন্তু যদি নিয়মপূর্ব্বক শরীরসকলকে শোধন করা না হয়, কিংবা যদি কোন শিক্ষার অভাব ঘটে, তাহা হইলে, ঐ শক্তি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে। যোগ অভ্যাস করিতে হইলে শরীর-শোধনের কেন আবশ্যক হয়, আমরা এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বোক্তপ্রকার সূত্র প্রস্তুত হইলে, মনুষ্য সজ্ঞানাবস্থায় স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া মানসশরীরে কার্য্য করিতে থাকেন। তখন যদি তাঁহার কোন আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে সকল মহাপুরুষ, পরোপকারের জন্য আধ্যাত্মিক (Spiritual) শরীর ধারণপূর্ব্বক প্রাণীদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই প্রয়োজন মিটাইয়া লন।

জন্মজন্মান্তরের সংযোগসূত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, কেবলমাত্র কামনা- শরীরে কিংবা মানস-শরীরে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত কার্য্য করিলে চলিবে না। যেহেতু, মানস শরীরও স্থূল এবং কামনা-শরীরের ন্যায় যথাকালে নিজ মৌলিক উপাদানের সহিত মিসাইয়া যায়। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের সময় এই সকল উপাদান মনুষ্যের সহিত পুনরায় আসিতে পারে না। কেবলমাত্র কারণশরীরই জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মনুষ্যের সহিত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাতে মানবের সকল বিষয়ের অভি-জ্ঞতা সঞ্চিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অন্যান্য শরীর হইতে সংবিৎকে গ্রহণ করিয়া মানস জগতের উচ্চতর ভূমিতে অর্থাৎকারণশরীরেই ঐ সংবিৎকে সংস্কাররূপে রাখা হয় এবং পুনর্জ্জন্মগ্রহণের সময় সংবিৎ, এই ভূমি হইতে নিম্নতর ভূমিসকলে যথাক্রমে আসিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, মৃত্যু প্রথমে স্থূল শরীরকে আক্রমণ করে;

পরে ঈথিরীয় ও তৎপরে কামনাশরীরকে ধ্বংস করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বশেষে দেবলোকে গিয়া উপস্থিত হয়। তথায় মৃত্যু, কেবল-মাত্র রূপভূমির মানসশরীরকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। মৃত্যুর রাজত্ব এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার প্রতাপ দেবলোকীয় অরূপভূমিতে উপনীত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া যায়; সুতরাং কারণশরীরের উপর ইহার কোনই আধিপত্য নাই। যদি কোন অপুষ্ট আত্মা সেই উচ্চতম ভূমিতে উপনীত হয়, তাহা হইলে সে তাহার সংজ্ঞাকে বজায় রাখিতে পারে না। সে যখন এই ভূমিতে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সহিত তাহার গুণসমূহের বীজসকল সংস্কাররূপে লইয়া যায়। সেই স্থানে ক্ষণকালের জন্য তাহার ভবিষ্যৎ এবং অতীতকালব্যাপী সংবিৎ প্রকাশ পায়; কিন্তু সেই লোকের মহিমা সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মা পুনর্জ্জন্মগ্রহণের জন্য অবরোহণ করে। অবরোহণ করিবার সময় ঐ সকল বীজ তাহার সহিত লইয়া আইসে এবং তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে যথাক্রমে ছড়াইয়া দেয়। ইহার ফল এই হয় যে, এই সকল বীজ পুনরায় তাহাদের উপযোগী পদার্থসকল সংগ্রহ করিয়া লয়। যখন উহা নিম্ন মানসজগতের রূপভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল বীজ তাহাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমির উপাদান আকৃষ্ট করিয়া লইয়া নূতন মানসশরীর রচনা করিয়া লয় এবং এই সকল সংগৃহীত উপাদান, অভ্যন্তরস্থ বীজসমূহের মানসিক গুণসকল (Characteristics) প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন বটবীজ, মৃত্তিকা এবং বায়ু হইতে নিজের উপযোগী পদার্থসকল সংগ্রহ করিয়া নিজের স্বভাবের অনুযায়ী কেবলমাত্র বটবৃক্ষই উৎপন্ন করে, আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন করে না। সেইরূপ মানসবীজসমূহ, নিজে-দের স্বভাবের উপযোগী পদার্থসমুদয় সংগ্রহ করিয়া থাকে, অন্য-প্রকার পদার্থ সংগ্রহ করে না। মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ যেমন বীজ বপন করে, তদ্রূপ ফলও পাইয়াও থাকে। মনুষ্য অতীত-

জন্মে যে সকল গুণের দ্বারা নিজকে গঠিত করিয়াছে, ইহজন্মে সেই প্রকার গুণের উপযোগী শরীর পাইয়া থাকে। মনুষ্য পুনর্জ্জন্মগ্রহণের সময় যখন কামনা-ভূমিতে অবরোহণ করে,তখন ঐ ভূমির উপযোগী বীজ-সকল প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহার উপযোগী কামিকপদার্থ ও মৌলিক সার পদার্থসকল (Elemental Essence) সংগৃহীত হইয়া, কামনা বা কামিক শরীর গঠিত হয়। এইরূপে এই প্রদেশের ক্ষুধা, ভাব (Emotions) এবং অন্যান্য প্রবৃত্তিসমূহ, তাহার উক্ত পুনর্গঠিত কামনা-শরীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়। সুতরাং যদি অতীতজন্মের সংজ্ঞা বজায় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কারণভূমিতে সংবিৎকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হইবে; কারণশরীর পুষ্ট করিয়া ঐ শরীরের সাহায্যে কার্য্য করিতে না পারিলে, জন্মজন্মান্তরের সংজ্ঞা আমাদিগের ভিতর বজায় থাকিবে না।

সমুদয় ভূমিতে জন্মজন্মান্তরের সংজ্ঞা বজায় রাখাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা যে কেবলমাত্র নিম্নতম তিন ভূমিতে সংবিতের চালনা করেন, তাহা নহে, আরও দুইটী উন্নত ভূমিতে অর্থাৎ উপনিষৎ যাহাকে 'তুরীয়' অবস্থা বলিয়াছেন, সেই তুরীয় ভূমিতে এবং তাহার উপর যে আর একটী ভূমি আছে, যাহাকে নির্ব্বাণভূমি বলা হয়, এই দুই ভূমিতে তাঁহারা জাগ্রৎ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, সংবিতের পরিচালনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ক্রমাভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রমাভি-ব্যক্তি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাকেই সংবিতের একীকরণ (Unificatian) বলা হয়; তাঁহাদের সংবিতের সকল আধারই রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল আধার আর তাঁহাদিগকে কোনরূপে আবদ্ধ করিতে পারে না এবং কার্য্য করিবার জন্য যখন যে কোন প্রকার শরীরধারণের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা ইচ্ছামত সেই প্রকার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন।

এই অবস্থায়, দেশ (space), কাল (time) এবং পাত্র (matter) জয় করা যায়। ঐরূপ উন্নত মানবকে ইহারা আর বাধা দিতে পারে না। মনুষ্য যখন কামনা-ভূমিতে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন দূরত্বের এবং সময়ের প্রভাব বহু পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। তখন যদিও মনুষ্যের জ্ঞান থাকে যে,তিনি দেশের (space) ভিতর দিয়া যাইতেছেন,কিন্তু তখন তাঁহার গতি এত দ্রুত হয় যে, সেই গতি প্রায় অনুমান করা যায় না। আবার মানসভূমিতে উপনীত হইলে, মনুষ্যের আরও বেশী ক্ষমতা জন্মে; তখন মনুষ্য যদি কোন স্থানের চিন্তা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পায় যে, চিন্তামাত্রেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; তখন যদি তিনি কোন বন্ধুর কথা চিন্তা করেন,তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে,তাঁহার বন্ধু তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছেন। এই তৃতীয় ভূমিতে দেশ,কাল এবং পাত্র একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। যখন যে বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ দেন,তখন সেই বিষয় দেখিতে পান; যখন যাহা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা শুনিতে পান। নিম্ন জগতে যাহাকে দেশ, কাল এবং পাত্র আখ্যা প্রদত্ত হয়, তাহা তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। যখন তিনি আরও উচ্চে আরোহণ করেন, তখন সংবিতের বাধা একেবারেই অপসারিত হয় এবং তিনি অপর প্রাণীদিগের সংবিৎসমূহের সহিত নিজের সংবিৎকে এক করিয়া থাকেন। ঐ প্রাণীরা যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ চিন্তা করিতে পারেন। উহারা যেরূপ অনুভব করে, তিনিও সেইরূপ অনুভব করিতে পারেন। তাহারা যেরূপ জানিতে পারে, তিনিও সেইরূপ জানিতে পারেন। তাহারা কিরূপ চিন্তা করিতেছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বুঝিবার জন্য তাহাদের সসীমত্বকে তিনি ক্ষণকালের জন্য নিজের সসীমত্বে পরিণত করিতে পারেন; এইরূপ করিয়াও তিনি তাঁহার নিজের প্রসারিত সংবিৎকে (Self consciousness) বজায় রাখেন; তাঁহার নিজের উন্নত জ্ঞানের দ্বারা অপরের সঙ্কীর্ণ

ও সীমাবদ্ধ চিন্তাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন এই বিপুল বিশ্বে তিনি নূতনতর কার্য্য করিতে থাকেন। এক পরমাত্মা, সকলের ভিতর বিরাজ করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া, তিনি অপর মনুষ্য হইতে নিজেকে পৃথক্ ভাবেন না, বরঞ্চ সেই উচ্চতর শ্রেণীর ভূমি হইতে অন্যকে সাহায্য করিবার জন্য, তাঁহার শক্তি চালনা করিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা কিরূপ অনুভব করে, তিনি তাহাও বুঝিতে পারেন এবং তাহারা যেরূপ সাহায্য কামনা করে, তিনি সেইরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। যাহারা ক্রমাভিব্যক্তির নিম্নতর সোপানে অবস্থিত, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি অসীম ক্ষমতাসকল উপার্জ্জন করিয়াছেন। তখন তাঁহার আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, কারণ, তখন তিনি যে বিষয়ে মনোযোগ দেন, তখনই সেই বিষয় জানিতে পারেন। ক্রমাভিব্যক্তির যে চক্রে তিনি আবর্ত্তিত হইয়াছেন. সেই চক্রের মধ্যে তাহারা রহিয়াছে, এই জন্য তিনি তাহাদিগের সকলকেই জানিতে পারেন এবং তাহাদের সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজে, নিজেকেই সাহায্য করিতেছেন। এই অবস্থায় মনুষ্যের "সোঽহং" জ্ঞান হয়; এই অবস্থায় মনুষ্যের পরা ভক্তি জন্মিয়া থাকে। উহাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা; উহাই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মনুষ্য প্রেতলোকে।

মরিলে কি গতি হয়,—এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে সকলেই ব্যগ্র। আমাদিগকে যে, একদিন না একদিন মরিতে হইবে, কেবলমাত্র সেই-জন্য যে আমরা ব্যগ্র, তাহা নহে, আমাদের যে সকল প্রিয় জনেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন,তাঁহাদিগের কি গতি হইয়াছে, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আর মিলন হইবে কি না, ইত্যাদি জানিবার জন্য আমরা উৎসুক থাকি। তাঁহাদের পারলৌকিক জীবনসম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইবার জন্য আমরা সময়ে সময়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকি।

মরিলে কিরূপ গতি হয়;—ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় কি না, তাহা স্বতঃই সকলের মনে উত্থিত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধর্ম্মে নানাপ্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ লোকে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া বরঞ্চ ভীত হইয়া থাকে। সকলেই, মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে,—মৃত্যুর নামে সকলেরই হৃৎকম্প হয়।

মনুষ্যজীবনে মৃত্যু একটী নির্দ্ধারিত ঘটনা—ইহা সকলেরই ভাবা উচিত। জন্মিলেই মরিতে হইবে, ইহা প্রকৃতির অনিবার্য্য নিয়ম। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যাঁহারা তাঁহাকে দয়াময় বলিয়া জানেন, তাঁহাদের ইহা বোঝা উচিত যে, মৃত্যু, যাহা আপামর সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে—তাহা—কখন মনুষ্যের পক্ষে অশুভকর হইতে পারে না; এবং ইহলোকে কিংবা পরলোকে যে লোকেই হউক, মনুষ্যগণ সেই জগৎপিতার ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছেন। যদি সকলে, সেই দয়াময়ের

ক্রোড়ে নির্ব্বিঘ্নে থাকেন. তবে আর মৃত্যুকে ভয় হয় কেন? মৃত্যু আমাদের ক্রমবিকাশের একটি সোপান মাত্র। উহা আমাদের শত্রু নহে, বরঞ্চ আমাদের বন্ধু। মৃত্যু আমাদিগের রূপান্তর ও অবস্থান্তর-মাত্র। যাহারা মৃত্যুকে ভয় করেন, কিংবা মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর অবস্থা বলিয়া জ্ঞাত আছেন,তাঁহাদিগকে পরাবিদ্যা (Theosophy) উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, তোমরা যেরূপ কল্পনা করিতেছ, মৃত্যু তাহা নহে; মৃত্যুর পরপারে আলোকের ও উৎসাহের রাজত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াও যেমন সকল পথ ও উপপথগুলি জ্ঞাত নহি, সেই প্রকার আমরা ঐ প্রদেশে থাকিয়াও উহা পরিজ্ঞাত নহি। বালক-বালিকারা উপকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাহাদের কল্পনাপ্রভাবে যেমন ভীত হইয়া উঠে, আমরাও সেই প্রকার মৃত্যু-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া ভীত হইয়া থাকি। বিশেষ আলোচনা করিলে, অবগত হওয়া যাইবে যে, মৃত্যু আমাদের শত্রু নহে; উহা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রাজ্যের দ্বার-স্বরূপ।

মৃত্যুসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—ইহা সত্য কি না? তাঁহাদিগকে আমরা ইহা বলিতে চাই যে, আমাদিগের বর্ণনায় যদি তাঁহাদের বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মহলের উজ্জ্বলরত্নদ্বয় সার উইলিয়াম্ ক্রুকস্ (Sir William Crookes), সার অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) এবং ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রী ব্যালফোর (Balfour) প্রমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট অনুসন্ধান করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, পারলৌকিক জীবন আছে কি না। বিলাতের Psychical Research * সমিতির পত্রিকাসকল পাঠ করুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে মৃত ব্যক্তিরা পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া

* অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-বিষয়ক সমাজ।

আসিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা দেয় কি না। ষ্টেড্ (Stead) সাহেবের Real Ghost Stories * নামক পুস্তক অথবা লেড্ বিটার (Leadbeater) সাহেবের Other Side of Death † নামক পুস্তক পাঠ করুন, তাহা হইলে অবগত হইবেন যে, পারলৌকিক জীবন আছে কি নাই। এই পুস্তকদ্বয়ে যে সকল ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য এবং যে সকল ব্যক্তির কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, মৃত ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখা দেয় কি না। যাঁহারা কাহারও বাক্য বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা স্বয়ং অনুসন্ধান করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, "ভূতের গল্প" বলিয়া উপহাস করিবার কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে ; সত্যাসত্য পরীক্ষা করা আমাদের হাত। পরীক্ষা না করিয়া উপহাস করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

পরাবিদ্যানুশীলনকারি ব্যক্তিগণ (Theosophists) অন্য প্রকারে সন্তুষ্ট হন না ; প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মনুষ্যের ভিতর গুপ্ত ক্ষমতাসকল এবং অবিকসিত ইন্দ্রিয়সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদিগের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা পরলোক দিবালোকের ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। পরাবিদ্যানুশীলন-কারীর ভিতরে অনেকেই সাধনা দ্বারা এই সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহের উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছেন। পরলোক-সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিয়া-ছেন, তাহাই আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে সংগৃহীত। পরাবিদ্যানুশীলনকারীরা, "আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে" বলিয়া, স্তোক বাক্য-প্রয়োগ করেন

* অথাৎ প্রকৃত ভূতের বৃত্তান্ত।

† অর্থাৎ মৃত্যুর পরপার।

না। তাঁহারা বলেন যে, এই সকল বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি; তোমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও—তবে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মৃত্যুর পর মনুষ্যের হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। "নক্ষত্র-লোকের" ভিতর দিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয় না। বরঞ্চ মৃত্যুর পূর্ব্বে মনুষ্য, যাহা ছিল, মৃত্যুর পরও তাহাই থাকে,—একই প্রকার বুদ্ধি (Intellect) একই প্রকার গুণ এবং একই প্রকার ক্ষমতা থাকে। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বকার বাসনা ও চিন্তা সকল, তাঁহার জন্য যে অবস্থা প্রস্তুত করিয়া রাখে, সেই অবস্থার মধ্যে তিনি তখন নিজেকে দেখিতে পান। মনুষ্য বাহির হইতে পুরস্কার কিংবা শাস্তি পান না। ইহলোকে তিনি যাহা করিয়া থাকেন, বলিয়া থাকেন কিংবা চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই সকলেরই ফল পরলোকে পাইয়া থাকেন। মনুষ্য ইহলোকে ঠিক্ যেন তাঁহার শয্যা রচনা করিতেছেন, পরলোকে তাঁহাকে তাহার উপর শুইতে হইবে। সুতরাং মৃত্যু-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ এই জ্ঞানলাভ করিতেছি যে, মৃত্যুর পর আমরা কোন অপরিচিত নূতন জীবন লাভ করি না, বরঞ্চ ইহজীবনের অবিচ্ছেদ (Continuation) উপভোগ করিতে থাকি। আমরা মৃত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে দূরে থাকি না, তাঁহারা হয়তো আমাদিগের নিকটে সকল সময় রহিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের এইমাত্র প্রভেদ যে, আমাদের সংবিৎ, পরিচ্ছিন্ন (Limited) হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমরা আমাদিগের প্রিয়-জনদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহাদিগকে আমরা হারাই না, তাঁহাদিগকে দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়া থাকি মাত্র। তাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথা কহিতে হইলে, কিংবা তাঁহাদিগকে দেখিতে হইলে, সংবিতের যে পরিমাণে প্রসারণের

(Expansion) প্রয়োজন, আমরা চেষ্টা করিলে সেই পরিমাণে সংবিতের প্রসারণ করিতে পারি। অনেকে জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহার ভুবর্লৌকিক বা প্রেত অথবা সূক্ষ্ম শরীরের উপর তাঁহার সংবিৎকে একত্রীকৃত (Focus) করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ লোককে তাহা করিতে হইলে, অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। নিদ্রিত অবস্থায় সকল ব্যক্তিই তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরের অল্পাধিক চালনা করিয়া থাকেন এবং এই প্রকারে ভুবর্লোকে বা প্রেতভূমিতে আমরা প্রতিদিন আমাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের সহিত কথাবার্ত্তা ও দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকি। তাঁহাদের সাক্ষাতের ও কথাবার্ত্তার ক্ষীণস্মৃতি সময় সময় আমাদের মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়। আমরা তখন বলি যে, আমরা অমুককে স্বপ্নে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহা ধ্রুবসত্য যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনের সহিত আমাদের ভালবাসার বন্ধন যেরূপ দৃঢ় ছিল. মৃত্যুর পরও সেইরূপ দৃঢ় থাকে। সুতরাং মনুষ্য, তাহার স্থূল আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করিলেই, সেই মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার প্রিয়জনের সঙ্গলাভের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তিদের এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে যে, তাঁহারা রাত্রিদিনের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র রাত্রিকালে তাঁহাদের প্রিয়জনের সহিত মিলিত হন এবং স্থূলের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম জগতে তাঁহারা তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

ভুবর্লোকের বা সূক্ষ্ম জগতের ঘটনাসকল, স্মৃতির সাহায্যে স্থূল জগতে আনিতে পারা যায় না বলিয়া যে, প্রেত লোকে আমাদের সংবিতের চালনার বাধা হইবে, তাহা নহে। সেই সকল ঘটনাকে স্মৃতিতে আনিতে পারা যাউক বা না যাউক, প্রেতাত্মাগণ আমাদের নিকটেই রহিয়াছেন; তাঁহারা শরীর-নামধেয় রক্তমাংসের আবরণ ত্যাগ করিয়াছেন,এই মাত্র পার্থক্য। আমরা গাত্র হইতে পিরাণ উন্মোচন

করিলে, আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের যেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় না, স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে তাঁহাদেরও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পিরাণ উন্মোচনের দ্বারা আমরা যেরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকি এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ অনুভব ও অল্প ভার বহন করিয়া থাকি, স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে, মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে অবিকল সেইরূপ হইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে মনুষ্যের যেরূপ কামনা, ভালবাসা, রাগ (Emotions) দ্বেষ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ছিল, মৃত্যুর পরও তাহাই থাকে। তাহাদের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে না। উহারা তাঁহাদের স্থূল শরীরে বাস করেন না বলিয়া, তাঁহার স্থূল শরীরত্যাগের সহিত উহাদেরও ধ্বংস হয় না। মৃত ব্যক্তিগণ স্থূল-দৈহিক আবরণ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার আবরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদের অনুভব ও চিন্তা শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে কিংবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

যে বিষয় স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার ধারণা করা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। আমাদের দৃষ্টি-শক্তির পরিসর অতি অল্প। আমরা বিশাল রাজত্বে বাস করিতেছি। কিন্তু তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। আমরা ঠিক্ যেন গবাক্ষহীন অন্ধকারময় দুর্গে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। সাধারণ লোকের জন্য ঐ দুর্গের একটীমাত্র গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহারই ভিতর দিয়া অত্যল্প যাহা দেখা যায়, আররা তাহাই দেখিতেছি। দিব্য দৃষ্টি (Clairvoyance) লাভ করিলে, আর একটী অধিক গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়, তাহার দ্বারা আরও একটু বেশী দেখা যায়। তখন আমরা অপর একটী বৃহৎ এবং নূতন জগতের ব্যাপার অবগত হইয়া থাকি। কিন্তু তথাচ আমাদের দৃষ্টিশক্তি কত অল্প!

এই নূতন জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা কি

দেখিতে পাই ? আমাদের সংবিৎকে যদি ভুবর্লোকে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা কি পার্থক্য দেখিতে পাইব ? প্রথম দৃষ্টিতে আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাইব না, আমরা পূর্ব্বে যে জগৎ দেখিয়াছিলাম সেই জগৎই দেখিতেছি, এইরূপ বোধ হইবে। কেন এইরূপ হয়, তাহা বুঝাইতে হইলে, সূক্ষ্ম জগতের পদার্থ বিজ্ঞান (Astral Physics) সম্বন্ধে সবিশেষ বলিতে হয়। যেমন এই পৃথিবীতে অবস্থা-ভেদে কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিন প্রকার অবস্থার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেতলোকেও সেইরূপ তিন প্রকার ভুবর্লৌকিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক প্রকার পদার্থ, তাহর অনুরূপ স্থূল জগতের পদার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় গৃহভিত্তি, সাজ, সজ্জা প্রভৃতি বিষয় একই প্রকার দেখিবেন। উহারা যে সকল স্থূল পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত, সেই সকল স্থূল পার্থিব (Physical) পদার্থ দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু তাহার অনুরূপ ভুবর্লৌকিক সূক্ষ্ম (Astral) পদার্থ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যদ্যপি তিনি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, প্রত্যেক ভুবর্লৌকিক সূক্ষ্মঅণু অত্যন্ত গতিশীল ও চঞ্চল। আমরা ইহলোকের পদার্থের অণুসকলের গতি দেখিতে পাই না ; কিন্তু মৃত ব্যক্তি প্রেতলৌকিক অণুর গতি দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা পরলোকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখেন না বলিয়া, এই গতি দেখিতে পান না ; সুতরাং মৃত্যুর দ্বারা যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা তাঁহারা হঠাৎ বুঝিতে পারেন না।

মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তি দেখিতে পান যে, তিনি পূর্ব্বের পরিচিত গৃহে রহিয়াছেন এবং তাঁহার ভালবাসার পাত্রগণ, পূর্ব্বের ন্যায় সেই গৃহে

বাস করিতেছেন। ভুবর্লৌকিক এই সকল ব্যক্তিদেরও প্রেতদেহ বর্ত্তমান থাকাতে সেই ব্যক্তি কেবলমাত্র ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এবং ধীরে ধীরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, কিছু না কিছুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন যে তাঁহার কষ্ট এবং ক্লান্তি চলিয়া গিয়াছে। উহাদের দ্বারা তিনি অভিভূত হন না। যন্ত্রণার এবং ক্লান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কি সৌভাগ্যের কথা, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। সেই জন্য যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন না যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কারণ, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, চিন্তা করিয়া থাকেন এবং অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি তখন বলিবেন—মনে করিবেন যে আমি মৃত নহি, আমি পূর্ব্বের ন্যায় জীবিত রহিয়াছি, বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থায় আছি।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, নিমিষের জন্য মৃতপ্রায় ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার সমুদয় জীবনের ঘটনার চিত্রসকল একে একে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। চিত্রগুলি যদি মনোরম হয়, তাহা হইলে তাঁহার সুখে মৃত্যু হয়; কিন্তু চিত্রগুলি যদ্যপি অপ্রীতিকর হয়, তাহা হইলে মনুষ্য অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। স্থূল দেহ ত্যাগ করিলেই মনুষ্য অচৈতন্য হইয়া পড়ে। যদি তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অতি শীঘ্র প্রেতলোকে চৈতন্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি তিনি বিশেষ উন্নত হন, তাহা হইলে তাঁহার অচৈতন্য অবস্থা কিছু বেশী কাল স্থায়ী হয়। ঐ সময়টুকু তাঁহার সুখের স্বপ্নের ন্যায় (Rosy Dream) অতিবাহিত হয়। যখন তাঁহার চৈতন্য হয়, তখন তিনি দেখিতে পান যে তিনি সুখের রাজত্বে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে আর নিম্ন প্রেতলোকের নিম্নপ্রদেশে কষ্টে কাল কাটাইতে হয় না।

মৃত ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা নিম্নোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া থাকেন। তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে তাঁহার বন্ধুদিগকে দেখিতে পান; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কিম্বা নিজের মনোভাব জানাইতে পারেন না। তিনি যখন তাঁহাদিগের সহিত কথা কহেন, তাঁহারা তখন শুনিতে পান না। তিনি যখন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন, তাঁহারা তখন তাহা অনুভব করিতে পারেন না। এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার মনকে প্রথম প্রথম এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং এই স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। কারণ তিনি জানেন যে অন্য সময়ে যাহাকে আমরা আমাদিগের নিদ্রিত অবস্থা বলি. তখন—তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার সহিত চির-পরিচিতের ন্যায় কথা কহিয়া থাকেন এবং তাহার সত্তা জ্ঞাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারেন যে, তিনি 'মৃত' এবং ইহা অবগত হইয়া তিনি ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠেন। ইহার কারণ কি? শিক্ষার দোষই ইহার মূল কারণ। তিনি জীবিত অবস্থায় পরলোক-সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন, এখন দেখিতে পাইতেছেন যে ইহা ঠিক্ তাহার বিপরীত। তিনি এখন কোথায় যে রহিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং তাঁহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছেন না। ইহাকে যদি নরক বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহা অনেক বিষয়ে ইহলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শিক্ষার দোষে যে কেবল ইহলোকে মনুষ্যের অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা নহে; পরলোকেও তাহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি মনুষ্যদিগকে নরকের ভয় দেখাইয়া বীভৎস নরকাগ্নির বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মনুষ্যের কি পর্য্যন্ত অপকার করেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ

করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যখন অপরাপর বুদ্ধিমান্ ও বিবেকশীল প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়, তখন তাঁহাদের সেই পূর্ব্বেকার নরকের সংস্কার দূর হয় এবং তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, ইহলৌকিক জীবনের ন্যায় পারলৌকিক জীবনেরও সার্থকতা আছে।

স্থূলদেহচ্যুতির পর জীব ক্রমশঃ জানিতে পারেন যে পরলোকে অনেক নূতন বিষয় আছে এবং ইহলোকে যে সকল বিষয় তিনি জানিতেন তাহার অনুরূপ বিষয়ও সেখানে আছে। প্রেতলোকে মনুষ্যের চিন্তা ও কামনা সকল দৃশ্যমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়,—এই সকল মূর্ত্তি প্রেত-ভূমির অতি সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা গঠিত। প্রেতলোকে বাস করিতে করিতে, প্রেতাত্মারা এই সকল ভাবনা ও কামনার আকৃতিকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে দেখিতে পান। ইহার কারণ এই যে, মনুষ্য ক্রমাগত স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অগ্রসর হইতেছেন। জন্মান্তরপরিগ্রহের রহস্য এই যে, জন্মপরিগ্রহশীল জীব প্রথমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রকাশ পান, পরে নিজের চেষ্টার দ্বারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অবস্থায় পুনরায় উপনীত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে জন্মজন্মান্তরের চক্র ঘূর্ণিত হইতেছে। এই চক্রের অতি অল্প অংশই পার্থিব লোকে প্রকাশ পায়। মনুষ্য এইচক্রে ঘূর্ণিত হইতে হইতে ইহলোকে অতি অল্প সময় কাটাইয়া থাকেন। মৃত্যুর পরে পরলোকেই মনুষ্যের ক্রমবিকাশ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধে একটী গোলা নিক্ষেপ করিলে, যেমন অল্প দূরে গিয়া উহার গতির বেগ হ্রাস হইয়া উহা স্থির হয় এবং অবশেষে ভূমিতে পতিত হয়, মনুষ্যেরও ঠিক্ সেই প্রকার গতি হইয়া থাকে। যে শক্তির প্রভাবে মনুষ্য জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই বহির্গামিনী শক্তি এই পার্থিব লোকে আসিয়াই ফুরাইয়া যায়। তৎপরে সেই শক্তি অন্তর্দিকে প্রত্যাহৃত হইতে থাকে এবং মনুষ্য

ক্রমশঃ তাঁহার উৎপত্তি স্থানে গিয়া উপনীত হন। ইহলোকে অবস্থান করিতে করিতে উক্ত বহির্গামিশক্তির হ্রাস হয়, তাহার ফলে মনুষ্য তাঁহার পার্থিব শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন। তারপর তাঁহার প্রেত-লৌকিক জীবন আরম্ভ হয়। এই প্রেতলৌকিক জীবনে ঐ শক্তির প্রত্যাহার বা সংকোচন (withdarwal) চলিতে থাকে। ইহার ফল এই হয় যে, যতই অধিক সময় অতিবাহিত হইতে থাকে মৃত ব্যক্তি নিম্ন প্রেতলৌকিক পদার্থে,—যাহার সৌসাদৃশ্য লইয়া স্থূল পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে,—ততই অল্প মনোযোগ দিতে থাকেন। সুতরাং তিনি ক্রমশঃ উচ্চ ভুবর্লৌকিক পদার্থে,—যাহার দ্বারা প্রেত-লোকে চিন্তার আকৃতি সকল গঠিত হয়।—আসক্ত হইতে থাকেন। এই প্রকারে তিনি চিন্তার রাজত্বে বাস করিতে থাকেন, এবং ইহলোকের অনুরূপ লোক অল্পে অল্পে তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তির যে লোক লাভ হয়, তাহাকে পিতৃ-লোক কহে। প্রেতলোকের ন্যায় ইহাও ভুবর্লোকের অপর একটি উন্নত অবস্থা-মাত্র। মৃত ব্যক্তি কোন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া যে এইরূপ হয়, তাহা নহে, তাঁহার আসক্তি এক কেন্দ্রচ্যুত হইয়া অন্য কেন্দ্রে সংলগ্ন হয় বলিয়া ঐরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার কামনা-সকল এখানেও বর্ত্তমান থাকে এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল কামনা ও বাসনার আকৃতি বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা এই সকল কামনার ও বাসনার পরিব্যঞ্জক মাত্র। এই সকল কামনা ও বাসনার তারতম্যের উপর তাঁহার প্রেতলৌকিক জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে।

প্রেত-লৌকিক জীবন পর্য্যাবেক্ষণ করিলে, সকলের প্রতি কেন যে ভাল ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, যে কার্য্যের দ্বারা পরের ক্ষতি হয়,

তাহা অত্যন্ত মন্দ কার্য্য, সুতরাং তাহা করা উচিত নয়। কিন্তু বাক্য কিম্বা কার্য্যের দ্বারা মন্দ বিষয় বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, কেবল-মাত্র মনে মনে যদ্যপি হিংসা, ঘৃণা, কুচিন্তা, অথবা মান সম্ভ্রমাদির দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিলে, মনুষ্যের নিজের কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। কিন্তু পারলৌকিক জীবনে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, যে সকল ব্যক্তি ইহলোকে ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি মনে পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি, তাঁহাদিগকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। দুইএকটি পারলৌকিক জীবনের ঘটনা-আলোচনা করিলে; ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমতঃ, একজন সাধারণ ব্যক্তি,—যে ব্যক্তি বিশেষ ভালও নহেন, কিম্বা বিশেষ মন্দও নহে, তাঁহার বিষয় আলোচনা করা যাউক। মৃত্যুর পর তাঁহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কোন বিশেষ বিষয়ে আসক্তি নাই বলিয়া, তাঁহার প্রেতজীবন অত্যন্ত 'একঘেয়ে' বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যদি তিনি তাস খেলিয়া কিম্বা গল্প করিয়া তাঁহার পার্থিবজীবন কাটাইয়া থাকেন, তাহা হইতে তিনি দেখিতে পান যে প্রেতলোকে ঐরূপ করিবার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার সময় অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি নীচাশয়, নীচদিকে যাহার মতিগতি এবং যাহার কামনা সকল পার্থিব জীবন ভিন্ন অন্য জীবনে উপভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই, মৃত্যুর পর তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠে। মদ্যপায়ী এবং কামুক ব্যক্তি পার্থিব জীবনে তাহার প্রবৃত্তিরই দাস হইয়া থাকে, সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে ঐরূপই থাকে; বরঞ্চ স্থূল শরীর না থাকাতে সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির ভয় থাকে না, ফলেই উহাদিগের প্রবৃত্তি-সকল সবেগে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রেতলোকে তাহার এই

দারুণ তৃষ্ণা মিটাইবার কোন আশা থাকে না। যাহার দ্বারা এই তৃষ্ণা মিটান যাইত, এখন সেই পার্থিব শরীরের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। ইহাকেই নরক যন্ত্রণা বলে। মনুষ্যকে অনেক দিন ধরিয়া,এই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। ভোগ করিতে করিতে, অল্পে অল্পে এই যন্ত্রণার ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ভিন্ন এই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু মনুষ্য যে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা তাহারই স্বকৃত। মন্দ-ভাবনা-রূপ যে বিষবৃক্ষটীকে সে রোপণ করিয়াছিল, তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। মনুষ্য যদি ইহলোকে তাহার কামনাকে বশীভূত করিতে শিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে পরকালে উহার ভার আর তাহাকে বহন করিতে হইবে না। মন্দ কামনাকে বশীভূত করিলে, তবে উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, নতুবা নিষ্কৃতি পাইবার অন্য উপায় নাই। যদি প্রেতলোক না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য সকল পাপের দাস হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিত এবং উত্তরোত্তর পাপ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার নিষ্কৃতির কোন আশা থাকিত না। পরলোকে এই প্রকারে ভোগের ক্ষয় হয় বলিয়া, মনুষ্য যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন পাপের এই সকল ভার লইয়া তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতা ও সংস্কার থাকে বলিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সে পুনর্ব্বার পাপ কার্য্য করিতে রত হয়। পরলোকে উচিত মত শিক্ষা হয় বলিয়া মনুষ্য জন্ম-জন্মান্তরে ক্রমে ক্রমে পাপের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য চেষ্টা করে। পরলোকে ভোগের ক্ষয়ের দ্বারা মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে।

যাঁহারা সদুপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, প্রেতলোকে তাঁহাদের কিরূপ গতি হয়, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। সকল মনুষ্যই

প্রায় পরিশ্রম ও কার্য্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এই সকল কার্য্য তাহারা আন্তরিক ইচ্ছার সহিত করে না। তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া, অথবা তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালনের উপায় থাকে না বলিয়া তাহারা পরিশ্রম ও কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরলোকে জীবনধারণের জন্য কোন আহার বা অর্থের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কোন পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয় না। পার্থিব জীবনের অবসানের পর মানব এই প্রথম অবকাশ পাইয়া থাকেন,—এই প্রথম স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার যদি কোন মনোমত প্রিয়কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে তখন তিনি সেই কার্য্যের জন্য তাঁহার সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহলোকে গীতবাদ্যে যাঁহার অত্যন্ত আনন্দ লাভ হইত, প্রেতলোকে ঐ সকল চর্চ্চা করিবার তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতবাদ্য তথায় প্রচুর পরিমাণে শ্রবণ করিতে পারা যায়। প্রেতলোকীয় অপার্থিব ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল লাভ হওয়াতে, তিনি অপার্থিব গীতবাদ্য প্রভৃতি শ্রবণ করিতে সক্ষম হন। যাঁহারা চিত্রবিদ্যা ভালবাসেন, তাঁহারা প্রেতলোকে সুন্দর সুন্দর বর্ণসমাবেশ এবং মনোরম ও নূতন নূতন বর্ণ সকল দেখিতে পান। যাঁহারা স্বভাবের শোভা ভালবাসেন তাঁহারা প্রকৃতির যে কত প্রকার শোভা দেখিয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহলোকে এই সকল শোভা দেখিতে হইলে অনেক যুগ কাটিয়া যাইত। যাঁহারা বিজ্ঞান কিম্বা ইতিহাস আলোচনা করিতে ভালবাসেন, পৃথিবীর সমুদয় পুস্তকাগার এবং বিজ্ঞানাগার তাঁহাদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁহাদের শিখিবার যথেষ্ট সুবিধাও হইয়া থাকে। এই সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয় এই যে, মনুষ্য সেখানে ক্লান্ত হয় না। আমরা ইহলোকে দেখিতে পাই যে কিছু বেশী মাত্রায় পড়াশুনা কিম্বা অন্য কোন প্রকার

কার্য্য করিলে আমাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু স্থূলদেহচ্যুত হইয়া আমরা যখন প্রেতলোকে বাস করি, তখন আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক না থাকাতে আমাদের ক্লান্তি অনুভূত হয় না। ইহলোকে আমাদের মন কখনও ক্লান্ত হয় না, আমাদের মস্তিষ্কই ক্লান্ত হইয়া থাকে।

ইহলোকের সহিত প্রেতলোকের তুলনা করিলে, আমরা জানিতে পারি যে, ইহলোকে বায়ু, জল, উত্তাপ প্রভৃতি না থাকিলে পার্থিব স্থূলদেহ রক্ষা করা অসম্ভব,—তাহাদের অভাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা সুখভোগী তাঁহাদের জন্য অট্টালিকা, উত্তম খাদ্য-দ্রব্য ও মূল্যবান বস্ত্রাদির আবশ্যক। যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ তাহাদের ইন্দ্রিয় ভোগের প্রয়োজন। যাঁহারা সম্রাট তাঁহাদের সেবা ও আজ্ঞা-পালনের জন্য শত সহস্র দাসদাসীর প্রয়োজন। যাঁহারা যোদ্ধা, তাঁহাদের পশুবৃত্তিগুলি সজীব ও উত্তেজিত করিবার জন্য মদ্য ও মাংসের প্রয়োজন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অন্নচিন্তা প্রবল,—অর্থ অর্থ করিয়া সকলেই লালায়িত। কিন্তু পরলোকে সকলব্যক্তিই সংসার-নির্ব্বাহ করিবার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পরলোকে অর্থের কোন প্রয়োজন হইবে না, সুতরাং যাহারা অর্থের জন্য লালায়িত, কিম্বা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নানারূপ কদর্য্য-কার্য্য করিতেছে, তাহাদের জীবন পরলোকে ভারস্বরূপ বোধ হইবে। পরলোকে মনুষ্যের স্থূল-দেহ থাকে না এবং স্থূলদেহের ভোগের উপযোগী বিষয়াদিও থাকেনা। কিন্তু স্থূলদেহ না থাকিলেও মনুষ্যের বাসনার ধ্বংস হয় না,—আসক্তিরও ধ্বংস হয় না। মদ্য ও মাংসলোভী ব্যক্তিগণের প্রেতলোকে মদ্য ও মাংস আস্বাদন করিবার জন্য পার্থিব জিহ্বা থাকিবে না বটে, কিন্তু আস্বাদনের স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে এবং সতেজে বর্ত্তমান থাকিবে। স্পৃহা মিটাইবার উপায় নাই, তিনি এইজন্য কষ্টে কালাতিপাত করিয়া

থাকেন। যিনি অর্থ ভালবাসেন, তিনি অর্থ খুঁজিয়া বেড়ান, কিন্তু সেখানে অর্থ না পাইয়া বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। যিনি দশটি সেবকের সাহায্য ভিন্ন এক পা চলিতে পারেন না, সেখানে কেহ কাহারও সেবক নয়, সকলেই স্বাধীন সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে সেবক অভাবে জড়বৎ অবস্থায় থাকিতে হইবে। যে সম্রাটের নাম শুনিলে সকলে আতঙ্কিত হইত, সেই সম্রাট প্রেতলোকে সকলকে হুকুম করিবেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে গ্রাহ্য করিবে না, বরং যে সকল লোকের উপর তিনি অত্যাচার করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিবে। বস্তুতঃ যাঁহারা পদসম্ভ্রম ও অর্থ পাইয়া নিজ সুখের জন্য অন্যের উপর অত্যাচার ও প্রভুত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পরকালে কষ্টের সীমা থাকিবে না। তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে যে দুঃখ ও ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহা-দিগকে সেই দুঃখ ও ক্লেশ শতগুণ সহ্য করিতে হইবে।

এইরূপে যে সম্রাটগণ তাঁহাদের প্রজাগণকে অসুখী করিয়াছিলেন, পরলোকে গমন করিয়া তাঁহাদের ক্লেশের সীমা থাকিবে না। যে সকল বিচারপতি অন্যায় করিয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেইসকল ব্যক্তির সমস্ত কষ্ট বহুকাল পর্য্যন্ত বহন করিতে হইবে। যাহারা সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে, কিম্বা যাহারা দুর্ব্বল জাতিকে পদতলে দলিত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইবে। যাহারা সুরাপান কিম্বা ব্যভিচার করিয়া জীবন কাটাইয়া থাকে, তাহাদের সুরাপান ও ব্যভিচার করিবার বাসনা থাকিয়া যাইবে, অথচ সুরা ও ব্যভিচারের সামগ্রী অভাবে তাহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। প্রেত-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, এই সকল হতভাগ্য প্রেতাত্মাগণ (Elementaries) মদ্যপায়ী কিম্বা বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ

করিয়া পরোক্ষভাবে নিজ নিজ পশুবৃত্তি তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন যে এই সকল পশুবৎ কলুষিত প্রেতাত্মাগণ অনেক সময় অন্যের দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্য করাইয়া লইয়া এই পৃথিবীর বিশেষ অপকার সাধন করিয়া থাকে।

সাধারণ মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার সংজ্ঞা থাকে না। সে কিছুক্ষণের জন্য গভীর নিদ্রায় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিদ্রাভঙ্গে সে যখন জাগরিত হয় তখন দেখিতে পায় যে, সে প্রেতলোকে অবস্থান করিতেছে। এই প্রেতলোকের অপর নাম কামলোক বা কামনাময় জগৎ বা ভূমি। তখন তাহার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়, কিন্তু প্রেতলোকের উপযোগী প্রেতশরীরের দ্বারা তাহার আসক্তি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রেত-শরীর মানবের জীবাত্মাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণ প্রেতশরীরের উপাদান মাত্র। কামনা ও বাসনা আমাদের স্থূলশরীরের কোন অংশ নহে, ঐ সকলের মূল কামনা বা প্রেতশরীরেই নিহিত। স্থূলশরীর উহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। ইহলৌকিক অথবা পার্থিব জীবনের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়সকল পরি-পুষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা ইহলোকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকে তাহাদের কষ্টের অবধি থাকে না। তাহাদের প্রেতলৌকিক শরীর তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া বৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।

ইহলোকবাসীরা প্রেতলোকবাসীদিগকে কতক পরিমাণে সাহায্য করিতে সক্ষম। এই সাহায্যের নাম শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া। পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রেত-লোকবাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া করিতে আমা-দিগকে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া দ্বারা প্রেতাত্মাগণের প্রেত-শরীর ত্যাগ হইতে পারে এবং দিব্য-শরীর ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে

গিয়া উপনীত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে আমাদিগকে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। শব্দের দ্বারা বায়ুতে স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ স্পন্দনের প্রভাবে সূক্ষ্ম পদার্থসকল পরিচালিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা যে প্রকার স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহা প্রেত-শরীরে আঘাত করিয়া উহাকে স্পন্দিত করিয়া থাকে এবং অধিক মাত্রায় স্পন্দন হয় বলিয়া প্রেতশরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য কবীর বলিলাছেন,—

"শব্দে মারা মর যাতা,
শব্দে জীবে জীব।"

অর্থাৎ শব্দের দ্বারা জীবকে মারাও যায় কিম্বা বাঁচানও যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যদি কোন বিশেষ প্রকার শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে ঐ শব্দের স্পন্দন প্রভাবে কাঁচের শক্ত স্থূল ফানসও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়; সেই প্রকারে বিশেষ প্রকার শব্দের প্রভাবে সূক্ষ্ম প্রেত-শরীরও ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু যে সে ব্যক্তি এই মন্ত্র নিয়মমত উচ্চারণ করিতে পারে না, সেইজন্য কোন ফল হয় না। শুদ্ধাচারী, অধ্যাত্মবিদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলে, তাহারই ফল হইয়া থাকে। এই প্রকারে উত্তম ব্রাহ্মণের দ্বারা আমরা পরলোকবাসী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের উপকার করিতে পারি।

মৃত্যুর পর মনুষ্য বাহিরের পরিবর্ত্তে অন্তরের দিকে মনোযোগ দিয়া থাকেন। তাঁহার স্থূল শরীরের নাশ হওয়াতে, তাঁহার মানসিক শক্তিসকল (Mental Energies) বাহিরে আসিতে পারে না, সুতরাং তখন মৃত মনুষ্য বাহ্যজগতের পরিবর্ত্তে কেবল মানস রাজ্যেই কার্য্য করিতে থাকেন। তখন আর স্থূল ইন্দ্রিয় থাকে না, সুতরাং মানস রাজ্যেই যে সকল শক্তি প্রেরিত হয়, সেই ব্যক্তি সেই সকল শক্তির স্পন্দন দ্বারা অতি শীঘ্রই স্পন্দিত হইয়া থাকে।

পার্থিব রাজ্যে তাঁহাকে যে পরিমাণে সাহায্য এবং সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না এক্ষণে মৃত্যুর পর তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাহায্য ও সন্তুষ্ট করা সম্ভবপর হয়। এই পার্থিব রাজ্যে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গণ যেমন স্নেহবাক্য কিম্বা যত্ন অক্লেশে গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেইরূপ মৃত লোকেরা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া যে লোকে গমন করেন, সেই লোকে তাঁহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ ভালবাসার এবং কল্যাণের চিন্তা সকল অক্লেশে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যে সকল ব্যক্তি সেই রাজত্বে চলিয়া যান, মৃত্যু-মরুভূমি হইতে সুখের রাজত্বে তাঁহাদের সদ্গতি হইবার জন্য ভালবাসা ও শান্তি পরিপূর্ণ চিন্তা সকল প্রেরণ করা নিতান্ত বিধেয়। যাঁহারা মৃত্যু মরুভূমিতে অবস্থিতি করিতেছেন,তাঁহারা অতি দুর্ভাগ্য,কারণ তাঁহাদের এমন কোন বন্ধুবান্ধব নাই, যাঁহারা মৃত্যুর এপার হইতে তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া সাহায্য করিতে হয়, তাহা অবগত আছেন। যদি পৃথিবীর লোকেরা বুঝিতে পারিত যে, স্বর্গীয় রাজত্বে গন্তব্য পথিক-দিগকে ভালবাসা ও সন্তোষের ভাবনা সকল প্রেরণ করিলে, তাঁহারা কত সুখী হন এবং সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃত্যুর পর-পারে কেহ নিরানন্দে ও দুঃখে কালক্ষেপ করিতেন না। আমরা সান্ত্বনা ও কল্যাণের চিন্তাসকল প্রেরণ করি না বলিয়াই মনুষ্যগণ সেইস্থানে অধিকদিন কষ্টে কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন।

আমাদের সুচিন্তাই সেই সকল মৃতব্যক্তির রক্ষাকর্ত্রী দেবী (Guardian Angel) স্বরূপা। মৃত্যুর পরও আমাদের প্রিয়জনদের ভালবাসা ও যত্নের উপর পূর্ব্বের ন্যায় সমান অধিকার থাকে, তবে আমরা ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মঙ্গলকামনা করিয়া সুচিন্তা প্রেরণ না করি কেন? যখন আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুর পরও আমরা সাহায্য করিতেছি, তখন আমাদের

কত আনন্দ হয়। আমাদের শোকসন্তপ্ত চিত্তে তখন শান্তির ধারা বর্ষিত হইতে থাকে। এইরূপ সুচিন্তা প্রেরণ করিলে মৃতব্যক্তিদের সদ্গতি হয় বলিয়া, আমাদের পূজ্যপাদ ঋষিরা মৃত্যের জন্য শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের আত্মার সদ্গতি হয়, মৃত্যু-মরুভূমির যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তাঁহারা শীঘ্র স্বর্গরাজ্যে উপনীত হন। খৃষ্টানদিগের ভিতর Mass এবং Prayer করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। তাঁহারা এই বলিয়া সুচিন্তা প্রেরণ করেনঃ— 'Grant him O Lord! Eternal peace, and let light perpetual shine on him."

যিনি পার্থিব লোকে ইন্দ্রিয়ের দাস হন নাই, বরঞ্চ ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিয়াছিলেন, প্রেতলোকে তাঁহার কি গতি হয় তাহা আলোচনা করা যাউক। মৃত্যুর পূর্ব্বে কামাদি রিপু সকলকে জয় করিয়া যিনি তাহাদিগকে হতবীর্য্য করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার ফল এই হয় যে, তাঁহার প্রেতলোকীয় কারা-গৃহরূপ শরীর প্রস্তুত হইবার জন্য অতি অল্পই উপকরণ মজুত থাকে। যেমন ইঁট ও চূণসুরকি না পাইলে গৃহ নির্ম্মিত হয় না, সেইরূপ কাম ক্রোধাদিরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি না পাইলে, ঐ কারাগাররূপ দেহ প্রস্তুত হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পর পারে সেই ব্যক্তি পবিত্র ও সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। এই শরীরের বন্ধন অতি শীঘ্র ভঙ্গ করা যায় এবং সেই ব্যক্তি অতিশীঘ্র প্রেতলোক ত্যাগ করিয়া পবিত্র লোকে প্রস্থান করেন। তখন প্রেতলোক তাঁহাকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না কিম্বা তাঁহাকে কোন জ্বালা যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে না। তিনি এমন শরীর প্রস্তুত করিয়াছেন যে, উহা আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না এবং তিনি কষ্ট এবং দুঃখ না পাইয়া, সুখে ও সচ্ছন্দে দেবতার প্রিয়ভূমি দেবস্থান (Devachan) বা স্বর্গলোকে গমন করেন।

পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তির কথা আলোচিত হইল, তাহাদের বাসনা সকল স্বার্থজড়িত। কিন্তু এমন ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা স্বার্থ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত নন, তাঁহারা মনুষ্য মাত্রেরই উপকার করিতে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় থাকেন? তাঁহারা প্রেতলোকে গিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরোপকার করিয়া থাকেন। তথায় সহস্র সহস্র এমন ব্যক্তি রহিয়াছে, যাহাদিগকে তাঁহারা পার্থিব লোকের অপেক্ষা অধিক এবং প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। তাঁহাদিগের ভিতর কেহ কেহ সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং কেহ কেহ বা তাঁহাদের মৃত বা জীবিত বন্ধু বান্ধবদের অথবা পরিবার বর্গের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে স্নেহময়ী জননী,—যিনি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রকে ইহলোকে রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন—তাঁহার সেই প্রিয় পুত্রকে উর্দ্ধলোক হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাহার রক্ষাকর্ত্রী দেবীরূপে বিরাজ করেন; অনেক সময় 'মৃত' স্বামী অতীতের ভাল-বাসা ও প্রেম হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার রুদ্যমানা প্রিয়তমা পত্নীর নিকট আসিয়া অলক্ষিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে, "পরলোক যদি এমন সুন্দর হয়, তাহা হইলে আত্মঘাতী হইয়া এ জীবন শেষ করাই ভাল, তাহা হইলে অন্নের চিন্তা, অর্থের চিন্তা, ক্লান্তি কিম্বা দুঃখ কিছুই থাকিবে না, অথচ পূর্ব্বের ন্যায় সমান ভালবাসার বন্ধনের ভিতর আত্মীয় স্বজন লইয়া আমরা বর্ত্তমান থাকিতে পাইব,—ইহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?" ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তুমি যদি কেবল মাত্র নিজের স্বার্থ লইয়া থাক, তুমি যদি নিজের সুখে উন্মত্ত থাক, তাহা হইলে ঐরূপ বলা খাটে বটে, কিন্তু যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তাহা হইলে তোমার ঐ রূপ বলা খাটিবে না। মনু-

ষ্যের ও ঈশ্বরের নিকট আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে; আমরা যে এই জগতে রহিয়াছি তাহার কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে এবং এই পার্থিব জগতে থাকিয়াই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পার্থিব জন্ম লাভ করিবার জন্য, জীবাত্মা অনেক কষ্ট ও অনেক বাধা ভোগ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার সেই চেষ্টাকে বৃথা উপেক্ষা করা উচিত নহে। ভগবান্ সকল মনুষ্যকে আত্মরক্ষার ইচ্ছা সমভাবে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন সম্ভব ততদিন এই পার্থিব শরীরকে রক্ষা চেষ্টা করা উচিত এবং যতদূর সম্ভব ততদূর এই পার্থিব জীবনের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই পার্থিব জীবনে অনেক বিষয় শিক্ষা করা যায় এবং যত শীঘ্র আমরা এই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারি তাহার চেষ্টা করা উচিত, কারণ তাহা হইলে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য আমাদিগকে আর এ নিম্নতম ভূমিতে বার বার আসিতে হইবে না। সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমাদিগের জীবন নষ্ট করা উচিত নহে। যথা সময়ে মৃত্যু আসিলে সুখের বিষয় হয়, কারণ তাহা হইলে আমরা কষ্ট ও পরিশ্রমের হাত এড়াইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতে পারি। যে ব্যক্তি যেমন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার নিকট প্রেতলোক সেইরূপ প্রতীয়মান হয়—কাহারও নিকট সুখের এবং কাহারও নিকট অসুখের স্থান হইয়া থাকে; কিন্তু প্রেত জীবনের ভোগের পর যে জীবন লাভ হয়, তাহা অতীব সুখের জীবন, কারণ তাহা সুখেরই রাজ্য, তাহার নাম স্বর্গলোক বা দেবস্থান।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, মৃত্যুর পর মনুষ্যের উন্নতি হইয়া থাকে কিনা? নিশ্চয়ই উন্নতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাস, প্রেতলোকে বাসনাক্ষয়ের দ্বারা তাহার উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি দয়ালু এবং পরপোকারী, তিনি প্রেতলোকে আরও অধিক পরিমাণে পরের উপকার সাধন ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন;

সুতরাং তিনি যখন পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন আরও অধিক সৎগুণের সমষ্টি সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

এ স্থলে আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, আমাদিগের প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা,—যাঁহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পরলোকে গিয়া চিনিতে পারিব কিনা? আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে চিনিতে পারিব, কারণ তাঁহাদিগের বা আমাদিগের তখন কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে,—

"তৎপ্রমাণবয়োঽবস্থাসংস্থানৈরপি তাদৃশঃ।"

—গরুড় পুরাণ, প্রেতখণ্ড।

অর্থাৎ, যে অবস্থায় ও যত বয়সে মৃত্যু ঘটে, প্রেতদেহ সেইরূপ কৃশ বা স্থূলভাবাপন্ন হয় এবং বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধবয়সের অনুরূপ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দেহসংস্থান মধ্যে কোন অঙ্গ অল্প বা অধিক অথবা অন্য কোনরূপ বিশেষত্ব থাকিলে, মৃত্যুর পর ঠিক সেই-রূপ প্রেতশরীর হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যুর পর অক্লেশে চিনিতে পারিব। ইহা ভিন্ন ইহলোক অপেক্ষা পরলোকে ভালবাসার টান অতি প্রবল হয় এবং চুম্বকের ন্যায় ইহা ভালবাসার পাত্রসকলকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি বহুপূর্ব্বে পার্থিবলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হয়তো প্রেতলোক ত্যাগ করিয়া দেবস্থানে যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা যতদিন না দেবস্থানে যাই, ততদিন পর্য্যন্ত প্রেতলোকে তাঁহাদিগের অদর্শন অনুভব করিতে হইবে। প্রিয়জনের ভিতর যাঁহারা শীঘ্র ইহধাম ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের সহিত প্রেতলোকে দেখা হইবে এবং যাঁহারা বহুপূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের

সহিত স্বর্গলোকে দেখা হইবে। ভালবাসায় বন্ধন অতি পবিত্র ও দৃঢ় বন্ধন—জনমে বা মরণে ইহা টুটে না।

ইহজীবনে যে ব্যক্তি তাঁহার বুদ্ধি (Intellect) এবং রাগ ও দ্বেষ সমূহের (Emotions) উন্নতি সাধন এবং পরের উপকার করিয়া থাকেন, মৃত্যুরপর তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার সৎকার্য্য সকল, সৎচিন্তা সকল এবং সৎ অনুভব সকল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইহারা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিবে এবং এই সকলের দ্বারা তাঁহার সুন্দর শরীর প্রস্তুত হইবে,—এই শরীরের দ্বারা তিনি স্বর্গের সুখ অনুভব করিবেন। সৎকার্য্য, সৎচিন্তা এবং সদ্‌বাসনার দ্বারা মনুষ্যের স্বর্গ-লৌকিক শরীর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত শরীর গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহলোকে চেষ্টা করা উচিত। সৎ বাসনার দ্বারা, সৎকর্ম্মের দ্বারা, সৎ ইচ্ছার দ্বারা, পরোপকারের দ্বারা এবং সৎ চিন্তার দ্বারা আমাদের এইরূপ শরীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিন্তার শক্তি যে কত প্রবল, তাহা সাধারণ ব্যক্তি অবগত নহেন ; প্রত্যেক বারে আমরা যখন একটী সৎ চিন্তা করিয়া থাকি, তখনই আমরা চিন্তার একটী সুন্দর আকৃতি (Thought Form) সৃজন করিয়া থাকি। ইহা আমাদিগের সন্নিকটে থাকে এবং আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য, সাহায্য করিয়া থাকে। জীবনের প্রত্যেক দিনের কিছু সময় সৎ চিন্তার জন্য অতিবাহিত করা সকলের উচিত। তাহা হইলে আমরা এমন শরীর প্রস্তুত করিব, যাহা মৃত্যুর পর আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, 'মনুষ্য তাহার ভাবনার উপযোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে', সুতরাং যে যেরূপ চিন্তা করিবে তাহার সেইরূপ লোক প্রাপ্তি হইবে। প্রত্যেক দিন আমাদিগের এমন একটী সময় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা উচিত যখন আমরা কোন

সৎচিন্তা করিতে পারিব, তাহা হইলে মৃত্যুর পর ঐ সকল চিন্তা আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট লোকে লইয়া যাইবে। আমরা স্বর্গের উপযোগী যেরূপ শরীর নির্ম্মিত করিব আমরা স্বর্গে সেইরূপ ভাবে অবস্থিতি করিব, অর্থাৎ যত অধিক সৎ উপকরণ এই শরীরে থাকিবে তত অধিককাল আমরা স্বর্গে বাস করিব।

মুনি-ঋষিরা সেইজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে, যজ্ঞ ও বলি অর্থাৎ ত্যাগ (Sacrifice) দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। মনুষ্য যদি নিজকে বলি দিতে পারে, অর্থাৎ যদি সে তাহার স্বার্থ বলি দিতে পারে, তাহা হইলে সে স্বর্গ সুখ উপভোগ করিবে। মনুষ্য যাহা বলি দিবে, তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্য হীরামুক্তার জন্য, অলঙ্কারে জন্য, বিষয়ের জন্য এবং বিলাসের জন্য কতই অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। এরূপ অর্থব্যয়ে কেহ কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করিতে হইলেই, যতই অনিচ্ছা। দেবতারা মনুষ্যের নিকট ইহাই চাহিয়া থাকেন যে, তাহারা যেন পরের জন্য দান করে,—যেমন কূপ খনন, বৃক্ষ রোপণ, দরিদ্রের ভরণপোষণ ইত্যাদি; ইহার দ্বারা পরের উপকার হইয়া থাকে। দেবতারাও ইহার পরিবর্ত্তে স্বর্গলোকের শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য, যত অধিক স্বার্থ বলি দিতে পারিবে, তাহার স্বর্গের জীবন তত অধিক কাল স্থায়ী ও সুখের হইবে।

পরলোকের আলোচনা করিলে, আমাদিগের মৃত্যুভয় চলিয়া যায় এবং জীবনের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে এবং সত্য পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, মৃত্যু তাঁহাদিগকে দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ প্রদান করিয়া থাকে। যদি ইন্দ্রিয়দিগকে এবং বাসনাসমূহকে দমন করিতে শিক্ষা করা যায়, এবং যদি পরোপকারের জন্য জীবন উপসর্গ করা যায়, তাহা হইলে, মৃত্যু যে অত্যন্ত সুখের হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মনুষ্য—স্বর্গলোকে।

প্রেত লোকের আলোচনা করিতে হইলে আমরা অবগত হই যে, সকল ব্যক্তিকেই ভুবর্ল্লোকে (Astral Plane) যাইতে হইবে। মৃত্যুর পর কেহ স্বর্গে কেহ প্রেতলোকে যাইবে, এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রথমতঃ সকল ব্যক্তিকেই ভুবর্ল্লোকে যাইতে হইবে। তাহার পর সকলকেই আবার উক্ত লোক হইতে স্বর্গলোকে যাইয়া থাকে। মৃত্যুর পর, সকল ব্যক্তিরই কিছু কালের জন্য সংজ্ঞা লোপ হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যক্তিদিগের সংজ্ঞা লাভ শীঘ্রই হইয়া থাকে,—তাঁহারা ভুবল্লোকের নিম্নভূমিতে অর্থাৎ প্রেতলোকে জাগ্রত হইয়া উঠে। প্রেতলোকের নিম্নভূমিতে জাগ্রত হওয়া অর্থে কেবল যন্ত্রণা ভোগ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং যাঁহারা কর্ম্মফলে শীঘ্র জাগ্রত হয়, তাহারা কষ্টভোগ করিতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা পার্থিব জীবনের সদ্ব্যবহার করেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের অজ্ঞানের অবস্থা কিছু বেশী দিন থাকে। তখন ঐ অবস্থা সুখের স্বপ্নের ন্যায় কাটিয়া যায়। তাঁহারা যখন জাগ্রত হন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে ভুবর্ল্লোকের উচ্চতর ভূমিতে দেখিতে পান। সুতরাং তাঁহারা আর প্রেতলোকের কষ্ট ভোগ করেন না। মনুষ্য যদি বিশেষ উন্নত হন, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয়, তখন তিনি আপনাকে স্বর্গলোকে উপস্থিত দেখিতে পান। এই জন্য সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, মৃত্যুর পর কেহ স্বর্গে যায় এবং কেহ নরকে যায়।

ভুবর্লোকের পর মনুষ্যের যে লোক লাভ হয়, তাহাকে স্বর্গলোক বলে। প্রায় সকল ধর্ম্মেই স্বর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে থাকিয়া পার্থিব জীবন কাটাইলেই স্বর্গভোগ করা যায়। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের মতে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, মানব পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গ-সুখ লাভ করে। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মের মতে মনুষ্য নিজেরই সৎকর্ম্মের ফলে স্বর্গ ভোগের অধিকারী হয়েন। যদিও সকল ধর্ম্মে জ্বলন্ত অক্ষরে স্বর্গীয় জীবনের বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই লোকের মনে স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ সকল বর্ণনা অদ্ভুত এবং সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া বোধ হয়। খ্রীষ্টানেরা, হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের স্বর্গের বর্ণনা—যেমন স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মণিমুক্তা বিভূষিত বনউপবন প্রভৃতি,—শ্রবণ করিয়া যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা খ্রীষ্টানদিগের স্বর্গের বর্ণনা—যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত রাজপথ এবং মণিমাণিক্য জড়িত গৃহাদি,—শ্রবণ করিয়া তেমনি আশ্চর্য্যান্বিত হন। সমুদয় ধর্ম্মে স্বর্গের এইরূপ হাস্যজনক অদ্ভুত বর্ণনা কেন করা হইয়াছে? এই সকল বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে আলোচনা করিতে গেলে হাস্যকর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যখন আমরা স্বর্গের শোভা বর্ণনাতীত বলিয়া বুঝিব, তখন ধর্ম্ম সকল সেই অবর্ণনীয় শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া কেন যে হাস্যাস্পদ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিব। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদের ইহজগতে সুখের, সৌন্দর্য্যের এবং জাঁকজমকের যেরূপ ধারণা আছে, সেই ধারণা অনুসারেই তাঁহারা স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ বন উপবনের দ্বারা এবং কেহ বা অট্টালিকা ও রাজপথ প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ববিদসাধকদিগের মধ্যে যাঁহারা সেই স্বর্গরাজ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই স্বর্গলোক স্বর্ণ-

রৌপ্য অথবা মণিমাণিক্য গঠিত বলিয়া বর্ণনা করেন না। সূর্য্যাস্তের সময় যে সকল মনোহর বর্ণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল বর্ণের দ্বারা তাঁহারা স্বর্গের সৌন্দর্য্যবর্ণনা করিয়া থাকেন।

স্বর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, স্বর্গ কথাটী কেবল রূপক অথবা কল্পনা প্রসূত নহে, প্রকৃতই ইহার অস্তিত্ব আছে। ইহা ভৌগলিক স্থানবিশেষও নহে,—আমাদের সংবিতের (Consciousnessএর) অবস্থাবিশেষ মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, স্বর্গ কোথায়? তাহার উত্তরে বলিব যে,ইহা এই স্থানেই এবং সর্ব্বত্রই রহিয়াছে—এই মুহুর্ত্তেই আমাদের ভিতরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকে এবং ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যে বায়ু গ্রহণ করিতেছি, সেই বায়ু অথবা ঈথর যেমন আমাদের নিকটে এবং সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গও সেই-রূপ আমাদের নিকট সেইভাবে রহিয়াছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, "আলোক তোমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, যদি তোমরা তোমাদের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিতে পার, তাহা হইলে সেই আলোক দেখিতে পাইবে।" চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিতে হইলে আমাদের সংবিতের প্রসারণ করিতে হইবে ও সূক্ষ্মতম পদার্থ নির্ম্মিত শরীররূপ পাত্রের উপরে আমাদের সংবিতকে একত্রীকৃত (focus) করিতে হইবে। যেমন ভুবর্লৌকিক শরীরে (Astral Body) সংবিতকে একত্রীকৃত করিলে প্রেতলোক দেখিতে এবং অনুভব করিতে পারা যায়। সেইরূপ সংবিতকে যদি আরও একটু উর্দ্ধে লইয়া যাওয়া যায় বা প্রসারণ করা যায়—অর্থাৎ যদি মানসশরীরে (Mental Body) অথবা মনোময় কোষে আমাদের সংবিতকে একত্রীকৃত করা যায়,তাহা হইলে স্বর্গভূমির বা স্বর্লোকের স্পন্দন সকল আমাদের মানসশরীর গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তখন আমরা স্থূলশরীর বিশিষ্ট হইয়াও

স্বর্গের অতুল আনন্দ সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইব। এইরূপ উন্নত অবস্থা পাইলে মনুষ্য আর নিম্নতম ভূমি অর্থাৎ এই পার্থিব লোকে সংবিতকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিবে না।

সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর পরে—মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নহে, কিছু-কাল পরে,—এই সুখের অবস্থায় উপনীত হয়। মৃত্যুর পর মনুষ্যের সংহরণ (withdrawal) চলিতে থাকে। সমুদয় প্রেত-জীবন ধরিয়া এই সংহরণ বা সঙ্কোচন চলিতে থাকে। পরে মনুষ্য যখন ভুবর্লৌকিক জীবনের প্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন পার্থিব জীবনের অবসানে ভৌতিকজগতে তাহার যেরূপ মৃত্যু হইয়াছিল, ভুবর্লোকেও সেইরূপ মৃত্যু হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনুষ্য তখন প্রেতলোকীয় শরীর ত্যাগ করিয়া সমুন্নত এবং পূর্ণ জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় মৃত্যুর পর, কোনরূপ কষ্ট কিম্বা দুঃখ আর মনুষ্যের অনুসরণ করে না। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এই মৃত্যুর পরেও, মনুষ্য কিছুকালের জন্য অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। ক্রমে মনুষ্য তাহার উন্নতির তারতম্যা-নুসারে এই অজ্ঞান অবস্থা হইতে অল্পাধিক কালের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে।

এই স্বর্গীয় ভূমিকে চিন্তার রাজ্যও বলা হয়। এই ভূমিতে মনুষ্য যাহা চিন্তা করে, সেই চিন্তা সজীব ও বাস্তবরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়। আমরা পার্থিব বস্তুসকলকে সত্য বলিয়া অবগত আছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহারা সত্য নহে। যাহা যথার্থ বস্তু, তাহা পার্থিব পদার্থের ভিতর লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই জন্য উচ্চভূমি হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যে সকল বিষয়কে যথার্থ বলিতেছি, তাহা যথার্থ নহে,—তাহা কেবল মায়াময় ছায়া মাত্র। কিন্তু যখনই আমরা চিন্তার রাজ্য বলি, তখনই পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ আমাদের মনে উদয় হয় যে, এই রাজত্ব নিশ্চয়ই অলীক। কিন্তু

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,মনুষ্য যখন তাহার ভৌতিক শরীর ত্যাগ করিয়া ভুবর্লৌকিক শরীর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সংবিতের প্রসারণ হওয়াতে তাহার প্রথমে এই অনুভূতি হয় যে, 'এই প্রেতলোক অতি সত্য।' তখন সে ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করে যে, 'আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যথার্থ জীবন কাহাকে বলে।' কিন্তু ভুবর্লৌকিকজীবন ত্যাগ করিয়া সে যখন উচ্চতর জীবন বা লোক প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পূর্ব্বের ন্যায় জীবনের সত্যতা সম্বন্ধে অনুভূতি হইয়া থাকে। কারণ ভুবর্লৌকিক জীবন হইতে এই জীবন এতাধিক বিস্তৃত,—এরূপ বাস্তব যে, ইহার আর তুলনা হয় না। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও একটী জীবন আছে যে জীবনের তুলনায় পূর্ব্বোক্ত জীবন সূর্য্যের কিরণের নিকট খদ্যোতজ্যোতিঃবৎ প্রতীয়মান হয়।

ভৌতিক রাজ্য অপেক্ষা চিন্তার রাজ্য যে সত্য, ইহা অনেকের নিকট হাস্যস্কর বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, মনুষ্যের এই জীবন অপেক্ষা যখন উচ্চতর জীবন লাভ হইবে, তখন সে সহস্র যুক্তির পরিবর্ত্তে এক মুহূর্ত্তে এই সকল ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

স্বর্লোকে বা স্বর্গভূমিতে ঐশ্বরীয় মনের (Divine Mind) অসীম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি মনুষ্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন, যদি তিনি তাঁহার আত্মদেবকে হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং অভিব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বর্গলোকের সমুদয় সৌন্দর্য্য তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে। কিন্তু আমাদের ভিতর সেরূপ লোক অতি বিরল;—কেহই সেরূপ পূর্ণ নহেন। সকলেই সেই মহৎ পথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন মাত্র, সুতরাং কেহই স্বর্গলোকের সমুদয় সৌন্দর্য্য আয়ত্তাধীন করিতে পারেন না। মনুষ্য পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা নিজকে যেরূপ গঠিত করিয়াছেন, সেই অনুসারে তাঁহার স্বর্গসুখ ভোগ হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির স্বর্গ বিভিন্ন

প্রকারের ও বিভিন্নকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি স্বর্গলোকে বিভিন্ন প্রকার ধারণক্ষম পাত্র লইয়া উপস্থিত হন,—কাহারও বৃহৎ এবং কাহারও বা ক্ষুদ্র পাত্র,—কিন্তু সকল ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করিয়া সুখ লইয়া যান। মনুষ্য তাঁহার কর্ম্মের তারতম্যানুসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই কর্ম্মের উপর তাঁহায় স্বর্গজীবনের কাল এবং তারতম্য নির্ভর করিতেছে। মনুষ্য যে প্রকার উপযুক্ত হন, সেই প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। সকলের ধারণার শক্তি সমান নয়, সুতরাং ভোগের সময় ও বিষয়ের তারতম্য সকলের সমান হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মফল অনুসারে কেহ অল্পকাল, কেহ বা বহুকাল ধরিয়া সুখভোগ করেন; এবং কেহ বা এক প্রকারের এবং কেহ বা অন্য প্রকারের সুখ ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং সকলের স্বর্গভোগ সমান নহে,—বিভিন্ন প্রকারের।

মনুষ্য পার্থিব জীবনে তাঁহার বাসনা ও কামনার দ্বারা ভুবর্লৌকিক শরীর গঠন করিয়া থাকেন এবং যতদিন ভুবর্লোকে বাস করেন, ততদিন ভুবর্লৌকিক শরীরে অবস্থিতি করেন। উক্ত শরীরের উপাদানের উপর তাঁহার ভুবর্লৌকিক অবস্থিতির কাল নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু তিনি যখন মানস জগতে আসিয়া উপনীত হন, তখন তাঁহার নরক (Purgatory) অথবা কাম বা প্রেতলোক বাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়; তখন তাঁহার নীচ স্বভাব ভোগের দ্বারায় পুড়িয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যে সকল উচ্চতর এবং শুভচিন্তা ও মহৎ এবং স্বার্থশূন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাদেরই অস্তিত্ব থাকে। মনুষ্য যখন ভুবর্লৌকিক ভূমি ত্যাগ করেন তখন ইহারা আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলে এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার আবরণ বা কোষ (Shell) প্রস্তুত করিয়া লয়।

এই আবরণের মধ্যদিয়া মনুষ্য স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম স্পন্দনসকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। যে সকল সুচিন্তা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাদের শক্তির প্রভাবে তিনি স্বর্গলোকের রত্নরাজি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। পার্থিবজগতে এবং ভুবর্লোকে মনুষ্য যে সকল চিন্তা এবং উচ্চাশা সৃজন করিয়াছেন, সেই সকল চিন্তা ও উচ্চাশার শক্তির দ্বারা তিনি স্বর্গসুখ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। মানসশরীর ঐ সকল সুখের ভাণ্ডার গৃহরূপে বিরাজ করিতে থাকে। মনুষ্যের ভালবাসার এবং ভক্তির উচ্চতম অংশ সকল এক্ষণে ফল উৎপাদন করিতে থাকে; স্বার্থের যাহাকিছু লেশ মাত্র ছিল, তাহা কামনা বা প্রেতজগতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পৃথিবীতে দুই প্রকার ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার ভালবাসা আছে, তাহাকে যথার্থ ভালবাসা বলা যাইতে পারে না—ইহা স্বার্থ জড়িত। যাঁহারা সেইরূপ ভালবাসেন, তাঁহারা ভালবাসার প্রতিদান পাইবার আশা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা হিংসা ও সন্দেহ জড়িত থাকে বলিয়া এইরূপ ভালবাসা স্বার্থযুক্ত হওয়া প্রযুক্ত, কামনাময় ভূমিতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু আর প্রকারের ভালবাসা আছে, যাহার জন্য মনুষ্য তাঁহার ভালবাসার-পাত্র, তাঁহার ভালবাসার প্রতিদান করিতেছে কিনা তাহা তিনি ফিরিয়া দেখেন না। মনুষ্য এই স্বার্থশূন্য ভালবাসার জন্য, তাঁহার ভালবাসার পাত্রের প্রতি অকপটে কেবল ভালবাসাই উপহার দিতে থাকেন। যে ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেই ভালবাসা, তিনি কার্য্যে কিরূপে প্রকাশ করিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে থাকেন। স্বার্থের লেশ মাত্র থাকে না বলিয়া এবং প্রতিদান পাইবার আশা না থাকাতে, এই ভালবাসাকে সসীম বা সান্ত বলা যায় না,—এই ভাল-বাসা অসীম ও অনন্ত। ইহার বেগ প্রেতলৌকিক পদার্থের দ্বারা

প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রেতভূমি ইহা ধারণা করিতে অক্ষম। উচ্চতর ভূমির সূক্ষ্মতম পদার্থ ও সম্বিতের প্রসস্ততা দ্বারাই ইহার উপযুক্ত প্রকাশ হইয়া থাকে। ভালবাসার ন্যায় ভগবানের প্রতি ভক্তিও দুই প্রকারের,—এক প্রকার স্বার্থ জড়িত, যেমন প্রার্থনার বিনিময়ে ভগবানের নিকট সুখ স্বচ্ছন্দাদির কামনা করা; এবং অপরটীতে ভগবদ্‌প্রেমে আত্মহারা হওয়া।

মনুষ্যের যখন ভগবদ্ভক্তির জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা আসে, তখন তাঁহার ব্যাকুলতার যেন তৃপ্তিসাধন হয় না,—উহা উত্তরোত্তর আরও যেন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন মনুষ্য নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে থাকেন তখন তাঁহার মনে এমন একটি ভাবের উদয় হয় যে, তাহা এই পার্থিব ভূমিতে ব্যক্ত করা যায় না। উচ্চ ধরণের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মনুষ্যের মনে যে ভাবের বিকাশ হয়, তাহা এই জগতে প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত ব্যাকুলতার, ভালবাসার এবং ভাবের শক্তি অসীম, কোন না কোন প্রকারে এবং কোন না কোন স্থানে উহাদের ফল ফলিবেই সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পৃথিবীতে যেমন শক্তির অনপচয়ের (Conservation of Energy) নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, উচ্চতর ভূমিতেও ঐ নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব ভূমি সঙ্কীর্ণ বলিয়া ঐ সকল শক্তি এখানে প্রকাশিত হয় না, উহারা সঞ্চিত থাকে মাত্র। মনুষ্য যখন তাঁহার সংবিতকে ইহজগতে কিম্বা ভূবর্ল্লোকে একত্রীকৃত করেন তখন ঐ সকল শক্তির কার্য্য হয় না। কিন্তু যখন মানসভূমিতে তাঁহার সংবিতকে একত্রীকৃত করেন, তখনই ঐ সকল শক্তির কার্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে—কিছুই এড়াইয়া যায় না। পার্থিব জগতে অনেক চেষ্টা করিয়া যে বিষয়ে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার ফল এখানে ফলিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বর্গলোকের ধারণা করিতে হইলে আমাদের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, প্রত্যেক মনুষ্য কর্ম্মফলে তাঁহার নিজ নিজ স্বর্গ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই স্বর্গীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য ও মহিমার বিকাশ যতদূর কল্পনা করা যাইতে পারে, ততদূর উহাদের বিকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্য ইহজগতে নিজ নিজ গবাক্ষ প্রস্তুত করিতেছেন, উহার ভিতর দিয়া স্বর্গের অসীম সৌন্দর্য্য ও মহিমার যতটুকু অংশ দেখা সম্ভবপর হয়, তিনি ততটুকু অংশ দেখিতে পান। তাঁহার চিন্তা-সমূহের প্রত্যেক আকৃতি, এক একটী গবাক্ষ মাত্র। ইহাদের দ্বারাই বহিঃস্থ শক্তি সকলের প্রতিসংবেদন (Response) পাওয়া যায়। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যদি কেবল মাত্র ঐহিক বিষয় লইয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উচ্চতর ভূমির সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিবার জন্য তিনি অতি অল্প সংখ্যক গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছেন। পার্থিব জীবনে মনুষ্য যদি আর কিছু না করিয়া কেবল একবার মাত্র পবিত্র ও স্বার্থশূন্য ভাবনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার ফলে তাঁহার স্বর্গ লোকে কেবল একটী মাত্র গবাক্ষ গঠিত হইবে। অসভ্য, আদিম ও বর্ব্বর জাতি ব্যতীত, সকল মনুষ্যই এই সুখের জীবনের কিছু না কিছু অনুভব করিতে পারিবেন। মৃত্যুর পর কেহ কেবল নরক ভোগ করিবে কিম্বা কেহ কেবল স্বর্গে যাইয়া কেবলমাত্র স্বর্গভোগ করিবে। এইরূপ বলিলে সঙ্গত হয় না, কারণ সকল মনুষ্যকেই উভয় প্রকার অবস্থা ভোগ করিতে হইবে—তবে ভোগের তারতম্যের প্রভেদ মাত্র।

আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, সাধারণ মনুষ্যের আত্মা (Ego) অতি অল্পই পুষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য তাহার সংবিতের ভৌতিক পাত্র অর্থাৎ স্থূলদেহকে সহজে কার্য্যোপযোগী করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার ভুবর্লৌকিক কার্য্যের স্মৃতি সকল সময়ে স্থূল

মস্তিষ্কে আনয়ন করিতে পারেন না বটে, তথাচ কতক পরিমাণে তাঁহার ভুবর্লোকিক শরীরে কার্য্য করিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মানস শরীরকে সংবিত বহনের আধার বলিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহার পার্থিব ও ভুবর্লোকিক শরীর দুইটীর মতন,এই শরীরটী স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারে না।

মানসভূমিতে বা স্বর্গলোকে আসিয়া যিনি পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণ শক্তি সহকারে কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তখন আর সাধারণ মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। স্থূল জগতে কোন সুদক্ষ মানব তাঁহার স্থূলশরীরকে যেরূপ দক্ষতা সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন,তিনি তাঁহার মানসশরীরকে ও তখন সেইরূপ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তখন তিনি পূর্ণ সংবিতের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির ঐরূপ হয় না, কারণ তাহার সংবিতের বাধা হইয়া থাকে। তিনি স্বর্গলোকে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য যেন এক একটী গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল গবাক্ষের ভিতর দিয়া যতটুকু দেখা সম্ভব, তিনি স্বর্গলোকের ততটুকুই দেখিতে পান। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার নিজের মত স্বর্গ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির কি প্রকারের স্বর্গ হয়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয়ের আলোচনা করা উচিত। প্রথমতঃ,—মানস-ভূমির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়ত,—তাঁহার চিন্তার দ্বারা উক্ত লোকের সূক্ষ্ম ভূত সমূহের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষার (Aspiration) দ্বারা ঐ ভূমিতে কিরূপ শক্তি সকল সমুদ্ভূত হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। উক্ত লোকে মনুষ্য কি প্রকারে চিন্তার আকৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূমি চিন্তার আবাসস্থল। এই ভূমিতে মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে সজীব শক্তি সমূহ অবস্থান করে,—ইহারাই

এই ভূমির স্বর্গীয় অধিবাসী। ইহাদের ভিতর কতকগুলি মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষার (Aspiration) দ্বারা স্পন্দিত হইয়া থাকে। এই ভূমিতে মনুষ্য যে সকল চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা পার্থিব ধরণের চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা মাত্র। কিন্তু ইহা স্বতঃই সকলের মনে উদয় হইতে পারে যে, যখন মনুষ্য এইরূপ সতেজ ও জীবনী-শক্তি পূর্ণ ক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখন তাঁহার পার্থিব ধরণের পরিবর্ত্তে, স্বর্গীয় ধরণের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা কেন না হয়? কিন্তু তাহা হয় না; কারণ, অপর দুইটী শরীরের ন্যায় তাঁহার মানসশরীর তখন একেবারে গঠিত হয় নাই এবং ইহা তখন তাঁহার নিজের বশেও আইসে নাই। বহু জন্ম ধরিয়া মানব এইরূপ অভ্যস্থ হইয়াছেন যে, কেবল পার্থিব ও ভুবর্লৌকিক উভয় শরীরের সাহার্য্যেই সংস্কার ও কার্য্য করিবার উদ্দীপনা পাইয়া থাকেন মনুষ্য এ পর্য্যন্ত এমন কোন কার্য্য করেন নাই, যাহার দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মানসশরীরের দ্বারা মানসিক স্পন্দন সকল গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং যখন মনুষ্য স্বর্গলোকে যান, তখন হঠাৎ কোন মানসিক স্পন্দনকে গ্রহণ করিতে কিম্বা উহার দ্বারা স্পন্দিত হইতে পারেন না। এই হেতু মনুষ্য তখন কোন প্রকার নূতন ধরণের চিন্তা করিতে অক্ষম। তিনি এই নূতন রাজত্ব দেখিবার জন্য যেরূপ গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া যে সকল চিন্তা আইসে, কেবল সেই ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন।

মাসনভূমিতে অর্থাৎ স্বর্গলোকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকল মনুষ্যের উপর কিরূপ প্রভাব স্থাপন করে, তাহা দেখা যাউক। উদাহরণের স্বরূপ ধরা যাউক যে, স্বর্গে মনুষ্যের যে সকল গবাক্ষ আছে, তাহার মধ্যে একটী গবাক্ষ সঙ্গীতের। সঙ্গীতের শক্তি অতি আশ্চর্য্য; ইহা মনুষ্যকে সময় বিশেষের জন্য নূতন রাজ্যে লইয়া গিয়া থাকে। যাঁহারা সঙ্গীতের রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন

যে, সঙ্গীতের কি অদ্ভুত শক্তি! যে মনুষ্যের প্রাণে সঙ্গীতের কোন উচ্ছাস উঠে না, তাঁহার প্রাণে সঙ্গীতের কোন গবাক্ষই উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু যাঁহার সঙ্গীতের গবাক্ষ উন্মুক্ত হইয়াছে, তিনি তিন প্রকার বিভিন্ন সংস্কার পাইবেন,—তাঁহার গবাক্ষে যে প্রকার কাঁচ সংলগ্ন আছে, সেই কাঁচের দ্বারা ঐ তিন প্রকার সংস্কারের পরিনমন বা রূপান্তর হইবে। সুতরাং এই কাচ তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কাঁচটী যদি রঙ্গিন হয়, তাহা হইলে কতকগুলি আলোকরশ্মি আসিতে পারিবে এবং কতকগুলি পারিবে না। কাঁচটী যদি মন্দ উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিকৃত করিবে, এক্ষণে ধরা যাউক যে, ঐ ব্যক্তির গবাক্ষ উত্তম, তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া সে ব্যক্তি কি প্রকার সংস্কার গ্রহণ করিবে?

প্রথমতঃ, ঐ উচ্চভূমিতে যে সকল শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের যে গতি রহিয়াছে, তিনি তাহাদেরই সুরযুক্ত সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন; কারণ, এই সকল উচ্চ ভূমিতে যে কোন প্রকার সঞ্চলন কিম্বা যে কোন একার কার্য্য হয়, তাহারা সুন্দর শব্দ ও বর্ণের সমতা ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের নিজের কিম্বা অপরের চিন্তা সকল এই প্রকার বর্ণনাতীত সুন্দর সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহারা এত সুমিষ্ট, যেন সরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার হইতেছে বলিয়া অনুমিত হইবে। স্বর্গীয় জীবনের এই প্রকার সুমিষ্ট ও সুস্বরযুক্ত প্রকাশ অবগত হইয়া তিনি অসীম আনন্দ ভোগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভূমিতে এক জাতীয় জীব (Entities) বাস করেন—যাঁহারা কেবল সঙ্গীতেরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অন্য উপায় অপেক্ষা সঙ্গীতের দ্বারাই নিজেদের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন,—তাঁহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব আখ্যা প্রদান

করা হইয়াছে। যিনি সঙ্গীত ভালবাসেন, তিনি স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্বদের ছবি আকর্ষণ করিবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া আনন্দের সহিত স্বর্গীয় সঙ্গীতের আলোচনা করিতে থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, যে সকল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সঙ্গীত তিনি শ্রবণ করিতে পাইবেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি গিয়াছেন,—যেমন তানসেন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি ব্যক্তি,—তাঁহারা সকলেই সেখানে বর্ত্তমান আছেন, কেহ মৃত নহেন, তাঁহারা সকলেই উৎসাহ পরিপূর্ণ এবং অপার্থিব সঙ্গীতের ধারা বর্ষণ করিতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে যেন অদ্ভুত স্বর্গীয় সঙ্গীতের এক একটী উৎস। পার্থিব লোকে যে সকল সঙ্গীতজ্ঞ আকস্মিক প্রত্যাবভাস (Inspiration) পাইয়া থাকেন, তাঁহারা বাস্তবিক ঐ সকল স্বর্গীয় সঙ্গীতের এক একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। সঙ্গীতে যাঁহারা সুপণ্ডিত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বীণাতন্ত্রীর সামান্য মাত্র একটী ধ্বনি হইতে তাঁহারা সময় সময় কত আশ্চর্য্য সঙ্গীত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইহা যে কিরূপ তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে হইলে অনেক পৃষ্ঠা লিখিতে হয়। এই প্রকারে ইহলোকের সঙ্গীতের সহিত স্বর্গীয় সঙ্গীতের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সেখানকার একটী সামান্য সুরকে এখানে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির গবাক্ষটী কলা (Art) বলিয়া পরিচিত ছিল, তাঁহারও উক্ত প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ হইবে—তাঁহারও উক্ত তিন প্রকার আনন্দ লাভ হইবে। কারণ, এই ভূমির ধারাই এই প্রকার যে, এখানে যে কিছু কার্য্য হয়, তাহা শব্দ ও বর্ণের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীরা (Theosophists) অবগত আছেন যে, দেবতাদেরও এক প্রকার ভাষা আছে, তাহা আর কিছুই নহে

কেবল বিভিন্ন প্রকারের বর্ণের সমাবেশ মাত্র; সুন্দর সুন্দর বর্ণের ছটার দ্বারা তাঁহারা পরস্পরকে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে যে সকল চিত্রকর ছিলেন, তাঁহাদিগকেও আমরা এখানে দেখিতে পাইব। তাঁহাদিগকে আমরা আর তুলি কিম্বা কাগজের সাহায্যে চিত্র করিতে দেখিতে পাইব না—তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ সহজ উপায়ে অঙ্কন করিতে দেখিতে পাইব। অর্থাৎ তাঁহাদের চিন্তার প্রভাবে মানসপ্রসূত বিষয় সমূহ গঠিত হইতেছে দেখিতে পাইব। সকল চিত্রকরই অবগত আছেন যে, তাঁহার চিত্র যত উত্তম হইলেও ঠিক তাঁহার মনের মতন হয় না; কিন্তু এ লোক বা ভূমিতে চিন্তা করিতে না করিতেই মনোহর ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট, জ্বলন্ত ও সজীব চিত্রাবলি চিত্রিত হইয়া যায়। এই ভূমিতে 'হতাশ' হওয়া কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানেন না। যত প্রকার উন্নত চিন্তার কার্য্য হইতে পারে, সেখানে তাহা সকলেরই হইয়া থাকে। উহা যে কি প্রকার এই পৃথিবীতে আমাদের ক্ষুদ্র মন তাহা ধারণা করিতে অক্ষম। যখন কোন সংগীত হইয়া থাকে, তখন উহা দিব্য বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করিয়া মানসভূমিতে বিচরণ করে। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাগ রাগিণীর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এই সকল মূর্ত্তিকে স্বর্গলোকবাসী সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পান।

মনুষ্য যাঁহাদিগকে ভালবাসেন কিম্বা যাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তি বা শ্রদ্ধা আছে, মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে তাঁহাদিগের সহিত মনুষ্যের কিরূপ সম্পর্ক থাকে, তাহা দেখা যাউক। সকলের মনে ইহা স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি স্বর্গে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহার ভালবাসার পাত্রদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিবেন কি না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনেরা যে

তথায় থাকিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, স্বর্গসুখভোগ করিতে করিতে আমাদের আত্মীয় স্বজনেরা কি ইহলোকে আমাদিগকে দেখিতে পান? কিম্বা তাঁহারা কি আমাদের সহিত মিলনের জন্য আশাপথ চাহিয়া থাকেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে,—"না"। মৃত ব্যক্তিরা যে সকল প্রিয়জন দিগের দুঃখে ও কষ্টে কিম্বা পাপ কার্য্যে রত দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা-দিগকে স্বর্গলোক হইতে দেখিতে পান না। কারণ স্বর্গলোকে দুঃখ বা কষ্টের স্পন্দন যাইতে পারে না। কেহ দুঃখ লইয়া স্বর্গভূমিতে থাকিতে পারেন না। কিন্তু যদি আমরা বলি যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়জন-দিগকে দেখিতে পান না বলিয়া কি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন? —না,তাহা হইলে তাঁহাদের কষ্টের লাঘব হইবে না, ফলতঃ বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগকে সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান থাকিতে হইবে। সুতরাং ঐ সময় তাঁহাদিগকে দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় কাটাইতে হইবে এবং তাঁহার প্রিয়জন বা বন্ধুগণ যখন স্বর্গলোকে যাইবেন, তখন তাঁহাদের হয়ত এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে যে, তাঁহাদের জন্য তখন আর তাঁহাদের কোন প্রকার সহানুভূতি থাকিবে না।

কিন্তু প্রকৃতি দেবী আমাদিগের জন্য এমন সুন্দর আয়োজন করিয়াছেন যে, আমাদিগকে ঐ দুইটী বিষয়ের জন্য কষ্টে পড়িতে হয় না। মনুষ্য যাহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, পরলোকে গিয়াও তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলেন না; প্রিয়জনেরা তখনও তাঁহাদিগের নিকটে থাকেন, তাঁহাদিগের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তথায় তাঁহারা কিরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, তখন আমরা তাঁহার একটী মানসচ্ছবি (M. ntal Image) গঠন করিয়া লই;—তখন তিনি আমাদের মানসক্ষেত্রে বিরাজ করিতে থাকেন।

আমরা যখন স্বর্গলোকে যাই, তখন আমরা আমাদের সহিত ঐ মানস-চ্ছবি সকল লইয়া যাই। কারণ,স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারাই মানস চ্ছবি গঠিত হইয়া থাকে, ইহা ঐ লোকেরই ধর্ম্ম। কিন্তু যেভালবাসার দ্বারা ঐ ছবি গঠিত হইয়াছে, তাহা একটী অদ্ভুত শক্তি,—এই শক্তি এত বলবতী যে, ইহা ভালবাসার পাত্রের অন্তরে গিয়া আঘাত করে। ইহার ফলে তাঁহার আত্মা স্পন্দিত হইয়া উঠে এবং আমরা যে মানস-চ্ছবি গঠন করিয়াছি, সেই মানসচ্ছবিকে উহা অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে এবং এই প্রকারেই আমাদের ভালবাসার পাত্র স্বর্গলোকে আমাদের নিকট বর্ত্তমান থাকেন। আমরা মনুষ্যের আত্মাকে ভাল-বাসি, তাহার শরীরকে ভালবাসি না, ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত ; এবং স্বর্গলোকে প্রিয়জনের আত্মাই (Soul) আমাদের সহিত অবস্থিতি করে। অনেকে বলিতে পারেন যে, কোন প্রিয়তম ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মা আমাদের সহিত স্বর্গলোকে থাকিতে পারেন সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এক ব্যক্তি কিরূপে একই সময়ে দুই স্থানে থাকিবেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—এক ব্যক্তি একই সময়ে দুই অথবা বহু স্থানে বিরাজ করিতে পারেন। এবং তিনি 'জীবিত' থাকুন অথবা 'মৃত' হউন, তাহাতে কিছুমাত্র আইসে যায় না। এস্থলে আত্মা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে আমরা এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা করিতে পারিব।

আমাদের আত্মা উচ্চতম ভূমিতেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ; নিম্নতর ভূমিতে ইঁহার যে সকল বিকাশ হইয়া থাকে, সেই সকলের অপেক্ষা ইহা মহান ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নিম্ন লোক বা ভূমিতে আত্মার যে সকল বিকাশ হয়, সেই সকল দ্বারা আত্মাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। একটী অপরটী অপেক্ষা মানে (Dimension) অধিক বলিয়া,

যেমন অসংখ্য সরল রেখার দ্বারা একটী বর্গাকৃতিকে (Square) ব্যক্ত করা যায় না, কিম্বা অসংখ্য বর্গাকৃতির দ্বারা একটী ঘনাকৃতিকে (Cube) ব্যক্ত করা যায় না, সেইরূপ আত্মার অসংখ্য বিকাশ দ্বারা আত্মাকে পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করা যায় না। ভূলোকে মানবের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইবার জন্য আত্মার অতি অল্প অংশই স্থূলশরীর দ্বারায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, এক সময়ে আত্মা একটী স্থূলশরীর গ্রহণ করিবেন। সহস্র সহস্র স্থূলশরীর ধারণ করিলেও আত্মা নিজ পূর্ণ ভাব বিকাশ করিতে পারেন না। মনুষ্যের একটী ব্যতীত দুইটী স্থূলশরীর না হইলেও যদি তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে বিশেষরূপে ভালবাসিয়া তাঁহার উদ্দেশে সমুন্নত মানসচ্ছবি সকল গঠিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মা এই উচ্চতর মানসভূমিতে উক্ত চিন্তামূর্ত্তি (Thought Torm) সমূহকে অনুপ্রাণিত করিবেন। কারণ এই ভূমি উচ্চতর বলিয়া, তাঁহার আত্মা নিজেকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা পার্থিব ভূমিতে একটী স্থূল-শরীরের দ্বারা অসম্পুর্ণ ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু উচ্চতম ভূমিতে আমাদের সসীমত্বের হ্রাস হওয়াতে, আমরা বহুপ্রকারে নিজেকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই। সুতরাং আমরা পার্থিব লোকে একটী স্থূল শরীর ভিন্ন দুইটী স্থূল শরীর ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু মানস-ভূমিতে আমরা আমাদের আকৃতির অনুরূপ অসংখ্য চিন্তা-মূর্ত্তিকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি।

একই সময়ে আত্মার দুইটী বিভিন্ন বিকাশ অর্থাৎ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমরা কি প্রকারে সংবিতের চালনা করিতে পারি, তাহা বুঝা যদি কঠিন বোধ হয়, তাহা হইলে একটী সাধারণ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন যে, আমরা যখন কাষ্ঠাসনে (Chair) বসিতে যাই, তখন একই সময়ে আমাদের বিভিন্ন প্রকারের

জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থাৎ একই সময়ে আমরা কাষ্ঠাসন স্পর্শ করি, আমাদের পদদ্বয় ভূমিতে রক্ষিত হয়, আমরা কাষ্ঠাসনের হস্ত স্পর্শ করি, এবং সেই সময়ে হয়তো একখানি পুস্তকও ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মস্তিষ্ক এই বিভিন্ন প্রকার ধারণা করিতে কষ্ট বোধ করে না। আমাদের সংবিৎবাহী সামান্য ভৌতিক মস্তিষ্ক যখন একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্যের ধারণা করিতে সক্ষম, তখন আমাদের আত্মা—যাহা ভৌতিক সংবিৎ হইতে কত মহান্—যে একই সময়ে দুই তিন ভূমিতে কার্য্য করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একই মনুষ্য যেমন বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত বা সংস্পর্শ (Contact) অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ একই মনুষ্য বিভিন্ন চিন্তার আকৃতিতে অবস্থিতি করিতে পারে। আবার সেই সমুদয় আকৃতিতে সে বাস্তব এবং সজীবভাবে বিরাজ করিতে সমর্থ হয়। স্থূলভূমিতে মনুষ্য নিজেকে যে পরিমাণে প্রকাশ করিতে পারে, এই মানস ভূমিতে সে তাহা অপেক্ষা নিজেকে সহস্র গুণ অধিক পরিমাণে প্রকাশ করিতে সক্ষম। অসাধারণ যোগীরা কায়ব্যূহ রচনা করিয়া অর্থাৎ বহু শরীর ধারণ করিয়া যে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করিতে পারেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপ মানসচ্ছবি গঠন করিলে আত্মীয়স্বজনের ক্রমবিকাশের কোন ক্ষতি হয় কি না? না, কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি পার্থিব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু তুমি ইহার জন্য যে মানসিক মূর্ত্তি গঠন করিয়াছ, তাহার সাহায্যে, সে ব্যক্তি অতি শীঘ্রই ভালবাসার গুণ সকল পুষ্ট করিতে পারিবে সুতরাং তোমার ভালবাসা তাহার অনেক উপকার করিতে পারে। যদি সৌভাগ্য ক্রমে অনেকগুলি আকৃতি গঠন করা

হয়, তাহা হইলে আত্মা সকল গুলিতেই বিরাজ করিতে সক্ষম হন। যদি আমাদের ভিতর ভালবাসার গুণ সকল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আমরা ভালবাসার দ্বারা অনেক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারিব। যে ব্যক্তিকে অনেক মনুষ্য ভালবাসে, তাহার বিভিন্ন অংশ একই সময় স্বর্গের বিভিন্ন প্রদেশে থাকিতে পারিবে, সুতরাং সে ব্যক্তির অভিব্যক্ত অতি শীঘ্রই হইতে পারিবে। ফলে তখন মনুষ্য যে কেবল মৃত অথবা জীবিত বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে ভালবাসা পাইবে, তাহা নহে, তাহার ভালবাসার গুণ সকলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

স্বতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, মনুষ্য যে এতকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে, তাহাতে তাহার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,স্বর্গে থাকিয়াও মনুষ্য তিন প্রকারে নিজের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। প্রথমতঃ, কতকগুলি সৎগুণের দ্বারা মনুষ্য স্বর্গে কতকগুলি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন। বহুকাল ধরিয়া ঐ সকল সৎগুণের চালনার দ্বারা মানব ঐ সকল গুণকে পুষ্ট করিয়া থাকেন; সুতরাং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যখন তিনি ইহলোকে অবরোহণ করেন, তখন ঐ সকল সৎগুণের সমষ্টিকে সঙ্গে লইয়া আইলেন। যে মনুষ্য সহস্র বৎসর ধরিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া যে ভালবাসিতে হয়, তাহা ভাল প্রকারেই অবগত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার গবাক্ষের ভিতর দিয়া যদি তিনি এরূপ আকাঙ্ক্ষার (Aspirations) প্রবাহ পাঠাইতে পারেন, যাহাতে তিনি কোন উচ্চ শ্রেণীর দেবতার সংসর্গে আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে এ ব্যক্তি অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তি যদ্যপি সঙ্গীতজ্ঞ হন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিবেন। যদি তিনি কলা বিদ্যা ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি

স্বর্গীয় কলা সমূহ শিখিবেন। এই প্রকারে মনুষ্য স্বর্গলোকে অনেক বিষয় শিখিয়া থাকেন। সুতরাং যখন তিনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণের সমষ্টি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ, মনুষ্য যে সকল ব্যক্তির মানসচ্ছবি গঠন করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্যক্তি যদি উন্নত পুরুষ হন, তাহা হইলে ঐ সকল মূর্ত্তির নিকট সেই মনুষ্য অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকেন। মনুষ্য যদি কোন মহাপুরুষের মানসমূর্ত্তি গঠিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বর্গলোকে ঐ মূর্ত্তির নিকট হইতে অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় শিখিবেন এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিবেন।

স্বর্গীয় জীবনের পর মনুষ্য আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যেমন মনুষ্য স্থূল দেহ ও প্রেত-দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ স্বর্গীয় দেহ ত্যাগ করেন। এই সুন্দর স্বর্গীয় জীবনও শেষ হইয়া থাকে। মনুষ্য তখত কারণ শরীর গ্রহণ করে। এই নূতন জীবনে মনুষ্যের জন্য কোন গবাক্ষের প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহাই মানবের যথার্থ আবাসগৃহ।

এই উচ্চভূমিতে অতি অল্প ব্যক্তিরই সংবিৎ বজায় থাকে। মনুষ্য সেখানে উপনীত হইলে স্বপ্নাবস্থায় থাকেন। পরিপুষ্ট হয় না বলিয়া, মনুষ্য সেখানে সংজ্ঞা বজায় রাখিতে পারেন না। কিন্তু মনুষ্য প্রত্যেক বার যখন এই ভূমিতে উপস্থিত হন, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইয়া থাকেন। মনুষ্য যতই পুষ্ট হইতে থাকেন, ততই তাঁহার স্বর্গীয়জীবন অধিক কাল স্থায়ী হয়। মনুষ্য যত উন্নত হন, ততই তিনি পরের উপকার ব্রতে ব্রতি হন। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য তখন তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এই উচ্চ জীবন সকলেই লাভ করিবেন—ইহাই পরা-বিদ্যার (Theosophy) বার্ত্তা। এই জীবন আমাদের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা পাইতে হইলে আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইবে।

ভু, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোকের সমাহারকে ত্রিলোকী বলে। জীব এই ত্রিলোকীর মধ্যে বারংবার জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। আসক্তিকেই শাস্ত্রে সংসারচক্রের নেমি বলা হইয়াছে। আমরা যদি আমাদের আসক্তিকে নষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইব। তখন আমরা ত্রিলোকীর গণ্ডীর বাহিরে যাইতে সমর্থ হইব। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন আসক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় নাই।

ওঁ শান্তি! শান্তিঃ! শান্তিঃ!!!

ওঁ হরি ওঁ!!!